প্রেয়সী

নিমাই ভট্টাচার্য

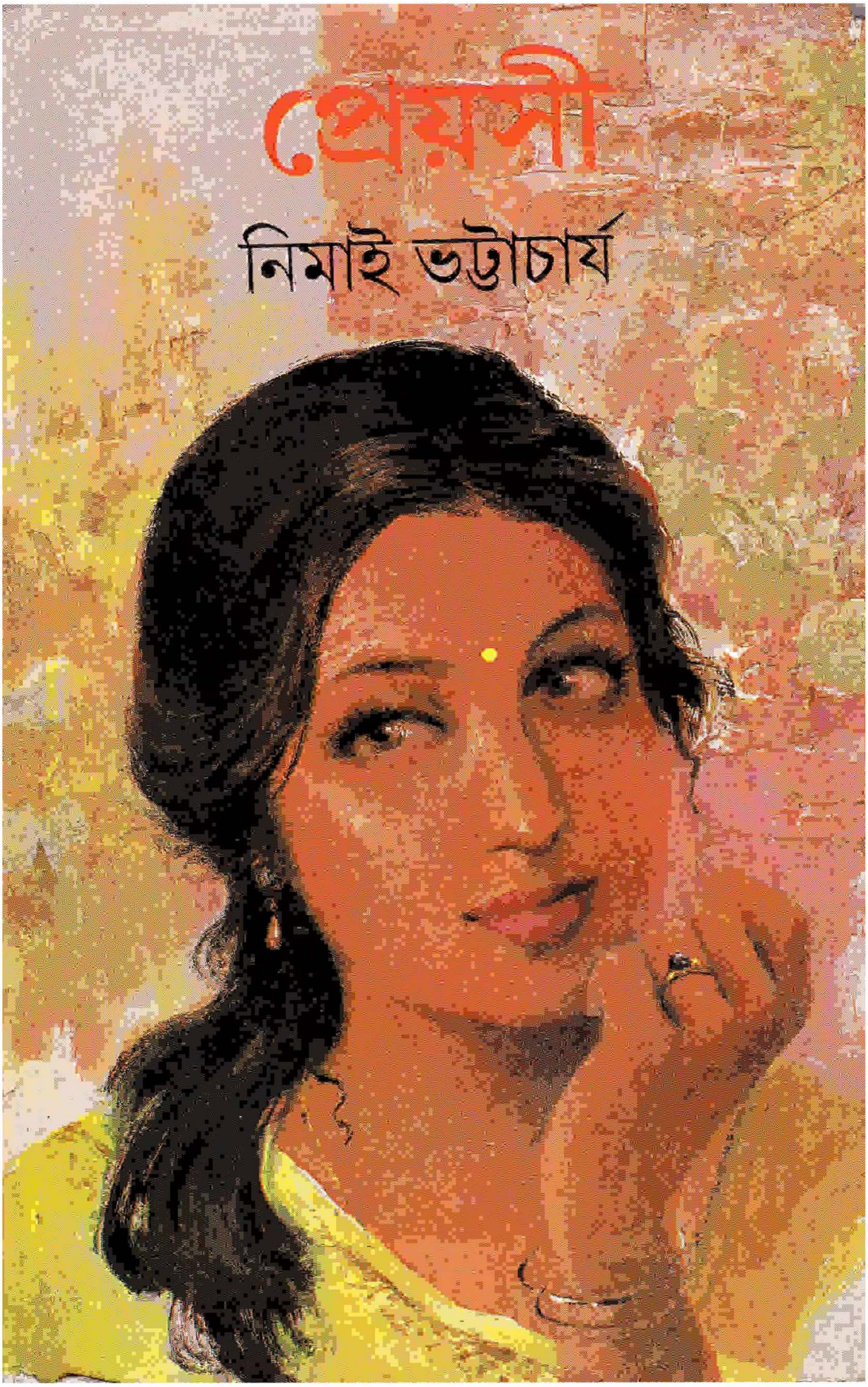

এক

ভারতী দেবী প্রায় ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকেই খুশির হাসি হেসে বলেন, জানিস শিবানী, আজ নির্মলাদির ওখানে একটা দারুণ ব্যাপার ঘটেছে?

দারুণ ব্যাপার মানে সারাদিন খুব ভাল কাটিয়েছিস তো?

হ্যাঁ, সারাদিন খুব আনন্দে কাটিয়েছি।

নির্মালাদির অনেক বন্ধু এসেছিল?

না, না, শুধু জন কয়েক পুরনো ছাত্রী এসেছিল।...

হঠাৎ পুরনো ছাত্রীরা এলো কেন?

নির্মলাদি ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর হয়ে যাচ্ছে, তাই ওরা ওকে ফেলিসিটেড করতে এসেছিল।

ভাল।

ভারতী দেবী হাসতে হাসতেই বলেন, ভাল মানে দারুণ ভাল ব্যাপার করেছিল মেয়েরা। ওরাই বাড়ি থেকে নানা রকম খাবার-দাবার এনেছিল, নির্মলাদিকে খুব সুন্দর একটা বালুচরী শাড়ি ছাড়াও নির্মলাদির স্বামীর জন্য ফিনলের ধুতি-গরদের পাঞ্জাবি আর চন্দন কাঠের সুন্দর লাঠি দিয়েছে।

বাঃ।

শিবানী দেবী একটু হেসে বলেন, মেয়েরা তো ভালই উপহার দিয়েছে।

মেয়েরা আরো অনেক কাণ্ড করেছে।

আবার কি করলো?

আবৃত্তি, ক্যারিকেচার আর...

ক্যারিকেচার?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ক্যারিকেচার।

ভারতী দেবী মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, ক্যারিকেচার করলো নির্মলাদিকে নিয়েই।

সেকি?

একটা মেয়ে দেখালো, উনি কি করে ক্লাসে পড়ান আর অন্য একটি মেয়ে দখালো, কলেজের করিডর দিয়ে যাতায়াতের সময় নির্মলাদি কি করে ছাত্রী আর অধ্যাপিকাদের সঙ্গে...

আচ্ছা!

তাই দেখে নির্মলাদি, ওর স্বামী আর আমরা হাসতে হাসতে পাগল হবার উপক্রম।

ভারতী দেবী একটু থেমে চাপা হাসি হেসে বলেন, এই সব ছাড়াও আরো একটা দারুণ কাণ্ড হয়েছে।

কি আবার দারুণ কাণ্ড ঘটলো?

তোকে কি বলব শিবানী, নির্মলাদির এক পুরনো ছাত্রীকে দেখে আমি চোখের পলক ফেলতে পারি না।

মেয়েটি বুঝি খুব সুন্দরী?

মেয়েটির রঙ খুব ফর্সা না, একটু চাপা কিন্তু তুই বিশ্বাস কর, ওকে দেখে মনে হলো যেন স্বয়ং বিশ্বকর্মা নিজের হাতে খোদাই করে ওকে তৈরি করেছেন।

খুব সুন্দর গড়ন বুঝি?

ওর চোখ-মুখ-নাক আর সুন্দর গড়ন দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।

শিবানী দেবী একটু হাসেন।

ভারতী দেবী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, তুই বিশ্বাস কর,একে অত সুন্দর দেখতে, তার উপর ওর গান শুনে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছি।

উনি না থেমেই বলেন, ওকে আমি কিছুতেই হাত ছাড়া করব না।

শিবানী দেবী চাপা হাসি হেসে বলেন, তুই মনে মনে ঠিক করেও ফেলেছিস ওর সঙ্গে বাবাই-এর বিয়ে দিবি?

মেয়েটি যদি তোরও পছন্দ হয়, তাহলে নিশ্চয়ই...

মেয়েটির নাম কি?

দুর্বা।

বাঃ! বেশ সুন্দর নাম।

ভারতী দেবী থামতে পারে না। বলেন, বল, তুই কবে দুর্বাকে দেখতে যাবি?

তুই ওর বাবার নাম, ঠিকানা....

সব লিখে নিয়েছি। তুই বললেই আমি ওদের বাড়ি টেলিফোন করব। বলব, গান শুনতে আসছি।

তুই বোধহয় তোর মনের কথা মেয়েটিকে বলেই দিয়েছিস, তাই না?

না, না, তাই কি বলতে পারি? তোর পছন্দ হবার পরই বলব।

শুধু তোর-আমার পছন্দ হলেই তো হলো না মেয়েটিকে দেখে দাদারও তো পছন্দ হওয়া চাই।

ভারতী দেবী একটু হেসে বলেন, আমি যদি বলি, আমাদের কাজের মেয়েটাকে শিবানীর পছন্দ হয়েছে, তাহলেও আমার ভোলানাথ স্বামী বলবে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভাল কথা। সরলা মেয়েটি সত্যি খুব ভদ্র সভ্য। সরলাকে বিয়ে করে বাবাই ঠিক সুখী....

শিবানী দেবী আর হাসি চেপে রাখতে পারেন না। বলেন, তুই দাদাকে কি ভাবিস বলতো?

কি আবার ভাবব? ভাবি, আমার ভোলানাথকে তুই বা আমি যা বলব, উনি বিন্দুমাত্র চিন্তা-ভাবনা না করেই মত দেবে। কোন ব্যাপারেই ও সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

বাজে বকিস না।

শিবানী দেবী না থেমেই বলেন, দাদা তো সংসারের ব্যাপারে তোর উপরই সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন বলে কোন ব্যাপারেই নাক গলান না।

সেটা কি খুব বাহাদুরীর ব্যাপার?

একশ বার বাহাদুরীর ব্যাপার। স্ত্রীরা যত শিক্ষিতা, যত বুদ্ধিমতীই হোক, তাদের উপর ক'জন স্বামী আস্থা রাখে? সংসারের সব ব্যাপারে নাক না গলালে পুরুষরা স্বামীত্ব ফলাবে কী করে?

তুই তো দাদার ঢোল বাজাবিই।

বাজাবই তো।

শিবানী দেবী ওর একটা হাত ধরে বলেন, দাদার মত স্বামী পেয়েছিস বলেই তুই এতগুলো বছর কেমন হাসি মুখে কাটিয়ে দিলি বলতো!

ভারতী দেবী উঠে দাঁড়িয়ে বলেন,আর বসব না। এখনও আমি বাড়িতে ঢুকিনি।

সেকি?

ক'দিন ধরেই কলেজ যাতায়াতের পথে ভারতী সব সময় একই কথা বলেন শিবানীকে।

বিশ্বাস কর শিবানী, আজকাল সব সময় শুধু দুর্বার কথাই মনে হয়। খুব ইচ্ছে করে ওকে দেখতে, ওর গান শুনতে।

এত যখন ইচ্ছে করছে, তখন ওকে ফোন করছিস না কেন?

ভাবছি, এত তাড়াতাড়ি কি ফোন করা ঠিক হবে?

হ্যাঁ, আরো কয়েকটা দিন যাক, তারপর ফোন করিস।

তাই করব কিন্তু ওর সঙ্গে একটু কথা বলতে এত ইচ্ছে করছে যে কি বলব!

দু'একদিন পর কলেজ থেকে ফেরার পথে শিবানী বলেন, আচ্ছা ভারতী, তুই তো এত বছর ধরে বেথুন কলেজে পড়াচ্ছিস ; কলেজের কোন মেয়েকে

দেখেই তোর এত ভাল লাগেনি?

হ্যাঁ, অনেক মেয়েকেই ভাল লেগেছে। তাদের অনেকের কথাই এখনও মনে হয় কিন্তু আগে তো বাবাইয়ের বিয়ের কথা ভাবতাম না।

তা ঠিক।

এখন বাবাই এম. টেক পাশ করে ভাল চাকরি করছে তাছাড়া বিয়েরও বয়স হয়েছে। তাই...

বুঝেছি।

আরো একটা সপ্তাহ এইভাবে কেটে গেল।

ভারতী আর ধৈর্য ধরতে পারেন না।

শিবানীর ঘরে ঢুকেই ভারতী বলেন, হ্যাঁরে, আজ এখুনি তোর এখান থেকে দুর্বাকে ফোন করব। আর দেরি করতে পারছি না।

শিবানী এক গাল হেসে বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কর। আর তোকে দেরি করতে হবে না।

হ্যালো, আমি ভারতী সরকার কথা বলছি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাসীমা, বলুন। আমি দুর্বা।

তাই বলি, এত মিষ্টি কণ্ঠস্বর কার।

দুর্বা একটু হাসে। বলে, আপনি এতদিন পর ফোন করলেন কেন? আমি তো কবে থেকে ভাবছি আপনার টেলিফোন আসবে।

ভাবছিলাম, তোমাকে বেশি বিরক্ত করা ঠিক হবে না।

প্লীজ মাসীমা, ওকথা বলবেন না। আপনি রোজ দু'বেলা ফোন করলে আমি খুশি হবো।

মা, অত লোভ দেখিও না। আমি কিন্তু সত্যি সত্যি দু'বেলা ফোন করা শুরু করে দেব।

হ্যান্ড-ফ্রী সেট। তাই রিসিভার হাতে তুলে নিতে হয়নি ভারতী দেবীর। উনি কথা বলছেন, শুনছেন হাত গুটিয়ে বসে থেকেই। শিবানী দেবী ওদের দু'জনের কথাই শুনছেন আর হাসছেন।

মাসীমা, আপনি ফোন করলে সত্যি আমি খুশি হবো।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ফোন করব কিন্তু কবে তোমার গান শুনতে আসব?

আপনি কাল এলে কালই শোনাবো। কাল না এলে, যেদিন ইচ্ছে আসুন। গান গাইতে, গান শোনাতে আমার ভালই লাগে।

ঠিক আছে, আমি দু'চার দিনের মধ্যেই আসছি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন।

তবে আমি একলা আসব না। আমি আমার সব চাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও বোন

শিবানীকে সঙ্গে নিয়েই আসব।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, শিবানী মাসীমাকেও নিয়ে আসবেন।

এবার ভারতী বলেন, দুর্বা, তোমার মা কি কাছাকাছি আছেন?

মা তো এখন বাড়ি নেই। সামনের বাড়ির ঠাকুমার শরীর খারাপ, তাই মা ঠাকুমাকে দেখতে গিয়েছেন।

ও!

উনি মুহূর্তের জন্যে থেমে বলেন, তাহলে মাকে বলো, আমি ফোন করেছিলাম।

সে তো বলবই।

তাহলে এখন রাখি?

হ্যাঁ, রাখুন তবে তাড়াতাড়ি আসবেন।

হ্যাঁ, মা, তাড়াতাড়িই আসব।

ওদের দু'জনের কথা শেষ হতেই শিবানী বলেন, দুর্বা তো ভারী সুন্দর কথা বলে।

দুর্বার কথাবার্তার মধ্যে বেশ একটা আন্তরিক ভাব আছে, তাই না?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস।

হাজার হোক সল্টলেক থেকে কসবা; দীর্ঘ পথ। সুতরাং ভারতী ঠিক করলেন, রবিবার বিকেলে যাবেন। সে খবর জেনে দুর্বা আর ওর মা—দুজনেই খুশি।

ওদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেই ভারতী হাজির শিবানীর কাছে।

হ্যাঁরে শিবানী, একটু আগেই আমি দুর্বা আর ওর মা-কে বললাম, রবিবার বিকেলে আসছি।

রবিবার কেন? আমি তো ভেবেছিলাম, তুই কাল-পরশুই যাবি।

দ্যাখ শিবানী, হাজার হোক বর্ষা কাল। দু'একদিন বৃষ্টি হচ্ছে না ঠিকই কিন্তু যখন-তখন তো বৃষ্টি হতে পারে।

তা তো পারেই।

রবিবার তো তোর দাদার অফিস নেই। সুতরাং গাড়িটা পাওয়া যাবে।

তা ঠিক।

তাছাড়া আমাদের এখান থেকে কসবা অনেকটা পথ। ট্যাক্সি পাব কি পাবো না, তার তো ঠিক নেই। তাই....

এমনি দিনে পাওয়া গেলেও একটু-আধটু বৃষ্টি হলেই ট্যাক্সি পাওয়া সত্যি....

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো রবিবার যাবো।

ঠিক আছে।

আমরা চারটে নাগাদ স্টার্ট করব তাহলে পাঁচটা নাগাদ দুর্বাদের ওখানে পৌঁছব। তারপর সুবিধে মতন....

শিবানী একটু হেসে বলে, হ্যাঁ, সেই ভাল।

শুক্রবার।

হ্যাঁরে শিবানী, তুই বল তো কি হাতে করে দুর্বাদের বাড়ি যাব।

দু'জনেই মিষ্টি নেব না।

হ্যাঁ, শুধু মিষ্টি নিয়ে যাওয়ার চাইতে দু'রকম জিনিষ নিয়ে যাওয়াই ভাল।

ভারতী সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, বলতো কি কি নিয়ে যাওয়া যায়।

শিবানী একটু ভেবেই বলেন, আচ্ছা ভারতী, যদি আমরা কে. সি. দাশ থেকে কিছু ভাল মিষ্টি নেওয়া ছাড়া পার্ক স্ট্রীটের কোয়ালিটি বা ওয়েসিস থেকে কিছু ভাল কাবাব-টিক্কা-চিকেন পাকৌড়ার মতো কিছু নিয়ে যাই...

খুব ভাল আইডিয়া।

দরজা খুলে মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলাকে দেখেই ভারতী হাত জোড় করে বলেন, নমস্কার! আমি ভারতী সরকার আর....

ভদ্রমহিলা একটু হেসে বলেন, উনি নিশ্চয়ই শিবানীদি?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।

আপনারা ভিতরে আসুন।

ভারতী আর শিবানী বারান্দায় উঠতে না উঠতেই দুর্বা লাফাতে লাফাতে এসে হাজির। দুজনকেই পায় হাত দিয়ে প্রণাম করে। সঙ্গে সঙ্গে এক গাল হেসে বলে, আপনারা এসেছেন বলে আমার খুব ভাল লাগছে।

ড্রইংরুমে পা দিয়েই শিবানী ওয়েসিসের প্যাকেটটা দুর্বার হাতে দিয়ে একটু হেসে বলেন, শিল্পী, এই নাও।

ভারতী কে. সি. দাশের প্যাকেটটা তুলে দেন দুর্বার মা-র হাতে। উনি বলেন, কি করেছেন বলুন তো আপনারা! এত কিছু....

দুর্বা বলে, ও মা! মনোরমা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের দই-মিষ্টি আর সিঙাড়া খেয়ে খেয়ে মুখে আরুচি ধরে গেছে। মাসীমারা কে. সি. দাশ—ওয়েসিসের খাবার-দাবার এনে ভালই করেছেন।

ওর কথা শুনে ভারতী আর শিবানী হাসেন।

দুর্বার মা ওদের বলেন, দেখছেন, আমার মেয়ে কি অসভ্য।

দুর্বা সঙ্গে সঙ্গে বলে, মা, কি অসভ্যতার মত কথা বলেছি? সত্যি করে বলো তো, মনোরমার দই-মিষ্টি-নোনতা খাবার খেতে তোমার ভাল লাগে?

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, মাসীমারা কি ইনকাম ট্যাক্স অফিসার যে ওদের কাছ থেকে সত্যি কথাটা লুকোতে হবে?

ওর কথা শুনে ভারতী আর শিবানী না হেসে পারেন না।

যাইহোক টুকটাক কথাবার্তা গল্পগুজব করতে করতে চা-টা খাওয়া শেষ হতেই

শিবানী দুর্বার দিকে তাকিয়ে বলেন, শিল্পী....

দুর্বা হো হো করে হেসে উঠে বলে, আপনি কি সত্যি আমাকে শিল্পী বলে ডাকবেন?

ভারতীর কাছে তোমার গানের যে প্রশংসা শুনেছি, তারপর তোমাকে শিল্পী না বলে উপায় নেই।

ভারতী ওকে বলেন, মা, গান শোনাবে না?

দুর্বার মা সুনন্দা দেবী বলেন, গান শোনাতে ময়না সব সময় রাজি। ও তো দিনরাত গান গায়। এমন কি খেতে বসেও....

ভারতী আর শিবানী প্রায় একই সঙ্গে বলেন, ও খেতে বসেও গান গায়?

আমাদের মায়া যখনই ওর সামনে ভাতের থালা আর ডালের বাটি রাখবে, তখনই ও গেয়ে উঠবে....

দুর্বা সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে—

কত কাল রবে
বল ভারত রে,
শুধু ডাল ভাত জল
পথ্য করে।
দেশে অন্নজলের হল ঘোর অনটন—
ধর হুইস্কী-সোডা
আর মুর্গি-মটন।...

ভারতী আর শিবানী হো হো করে হেসে ওঠেন।

দুর্বা ওদের দিকে তাকিয়ে বলে, সত্যি, আমি যখন-তখন যেখানে-সেখানে হঠাৎ গান না গেয়ে থাকতে পারি না। এইতো পরশু দিনই ইউনিভার্সিটি গিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি, আমার, তিন-চারটে বন্ধু একটা গাছের ছায়ায় বসে খুব ফিস-ফিস করছে।

ও হঠাৎ ডান হাতে তুড়ি দিয়েই বলল, ব্যস। আমি হঠাৎ ওদের সামনে হাজির হয়েই গেয়ে উঠি—

ওলো সই, ওলো সই
আমার ইচ্ছা করে তোদের মতো
মনের কথা কই।
ছড়িয়ে দিয়ে পা দুখানি
কোনে বসে কানাকানি,
কভু হেসে কভু কেঁদে
চেয়ে বসে রই।
ওলো সই, ওলো সই।

তোদের আছে মনের কথা,
আমার আছে কই।
আমি কী বলিব, কার কথা,
কোন্ সুখ, কোন ব্যথা—
নাই কথা, তবু সাধ
শত কথা কই।
ওলো সই, ওলো সই....

দুর্বার গান শেষ হতেই শিবানী বন্ধুর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলেন, ইন্টারেস্টিং মেয়ে শিল্পী!

হ্যাঁ, তাইতো দেখছি।

ভারতী সঙ্গে সঙ্গেই দুর্বাকে বলেন, এবার হামোনিয়াম বাজিয়ে ভাল করে গান শোনাও।

এবার চলুন আমার ঘরে।

সুনন্দা দেবী বলেন, হ্যাঁ, দিদি, আপনারা ওর ঘরে যান। আপনারা ময়নার গান শুনুন। আমি একটু দোকান থেকে ঘুরে আসি।

দুর্বার ঘরে ঢুকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়েই শিবানী বলেন, হ্যাঁ, শিল্পীর ঘর এই রকমই হওয়া উচিত।

হ্যাঁ, শিবানী, তুই ঠিকই বলেছিস। ভারী সুন্দর রুচিসম্পন্ন করে সাজানো।

মাসীমারা, আপনারা আগে বসুন। অত প্রশংসা করার মতো ঘর আমার না। নিছক একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করি।

হ্যাঁ, ওরা দু'জনে দুটো বেতের চেয়ারে পাশাপাশি বসতেই দুর্বা হারমোনিয়াম নিয়ে ওর খাটে বসে। বলে, আপনারা বলুন, কি ধরনের গান শুনতে চান।

দুর্বা সঙ্গে সঙ্গে বলে, আমি কিন্তু শুধু রবীন্দ্রনাথের গানই গাইতে পারি।

সকাল থেকেই মেঘ করেছে। দু'এক পশলা বৃষ্টিও ইতিমধ্যে হয়েছে। এখন আবার মেঘ ডাকতে শুরু করেছে। তাই জানলা দিয়ে একবার আকাশের দিকে তাকিয়েই দুর্বা গেয়ে ওঠে—

এসো হে এসো সজল ঘন
বাদল বরিষনে—
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে
এসো হে এ জীবনে।
এসো হে গিরিশিখর চুমি,
ছায়ায়ঘিরি কানন ভূমি
গগন ছেয়েএসো হে তুমি
গভীর গরজনে।....

ভারতী বা শিবানী কোন মন্তব্য করার আগেই দুর্বা আবার শুরু করে—

চিত্ত আমার হারালো আজ
মেঘের মাঝখানে—
কোথায় ছুটে চলেছে সে
কোথায়কে জানে।
বিজুলিতার বীণার তারে
আঘাত করে বারে বারে,
বুকের মাঝে বজ্র বাজে
কী মহাতানে।
চিত্ত আমার হারালো আজ
মেঘের মাঝখানে...

গান শেষ হতেই দুর্বা মুখ তুলে ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনাদের ভাল লাগছে তো?

ভারতী বলেন, অপূর্ব।

শিবানী বলেন, সাধে কী তোমার নাম রেখেছি শিল্পী?

দুর্বা বলে, এবার কি পূজা বা প্রেম পর্যায়ের গান গাইব?

শিবানী বলেন, তুমি এবার প্রেম পর্যায়ের গান শোনাও।

ব্যস! দুর্বা গেয়ে ওঠে—

আকাশে আজ কোন্ চরণের
যাওয়া-আসা।
বাতাসে আজ কোন্ পরশের
লাগে হাওয়া॥...

ঐ গান শেষ হতেই দুর্বা আবার শুরু করে—

আসা-যাওয়ার পথের ধারে
গান গেয়ে মোর কেটেছে দিন।
যাবার বেলায় দেব কারে
বুকের কাছে বাজল যে বীণ॥
সুরগুলি তার নানা ভাগে
রেখে যাব পুষ্পরাগে,
মীড়গুলি তার মেঘের রেখায়
স্বর্ণলেখায় করব বিলীন॥
আসা-যাওয়ার পথের ধারে,
গান গেয়ে মোর কেটেছে দিন....

গান শেষ হতে না হতেই সুনন্দা ঘরে ঢুকলেন। জিজ্ঞেস করেন, ময়নার

গান আপনাদের কেমন লাগছে?

ভারতী বলেন, আপনার ময়নার গান শোনার লোভেই তো সল্টলেক থেকে কসবা এলাম।

শিবানী বলেন, আমি তো ভাবছি, আপনার মেয়েকে তুলে নিয়ে যাই।

সুনন্দা একটু হেসে বলেন, হ্যাঁ, স্বচ্ছন্দে তুলে নিয়ে যান কিন্তু একটা ভাল ছেলের সঙ্গে ওকে সাতপাক ঘুরিয়ে দিতে হবে।

ভারতী প্রশ্ন করেন, সত্যি কি মেয়ের বিয়ে দিতে চান?

একশ বার চাই।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, মেয়ের এম. এ. পড়া হয়ে গেল।এবার তো মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে।

আপনারা পাত্র দেখছেন না?

আসল কথা হচ্ছে, ময়নার বাবাকে কলকাতার একটা আর ফরিদাবাদ-হায়দ্রাবাদের দুটো ফ্যাক্টরি দেখতে হয়। উনি মাসে দশ-বারো দিনের বেশি কলকাতাতেই থাকতে পারেন না। তাছাড়া....

তাছাড়া আবার কি?

ময়নার কোন কাকা-জ্যেঠা বা পিসীও নেই যে তারা ওর পাত্রের খোঁজ...

বুঝেছি।

শিবানী সঙ্গে সঙ্গে একটু হেসে বলেন, সুনন্দাদি, আমি কিন্তু ভাল ঘটকালি করতে পারি।

সুনন্দাও হেসে বলেন, ময়নার জন্য ভাল পাত্র দেখে না দিলে কী করে বুঝব আপনি....

ভারতী হাসতে হাসতে বলেন, সুনন্দাদি, ওকে খেপিয়ে দেবেন না। ও হয়তো কালই পাত্র নিয়ে হাজির হবে।

ওনার কথায় সুনন্দা না হেসে পারেন না।

দুর্বা হাসতে হাসতে শিবানীকে বলে, মাসীমা, আপনি কোন ছেলের হয়ে আমাকে দেখতে বা পরীক্ষা নিতে আসেন নি তো?

এইসব গোপনকথা তোমাকে বলব কেন?

যাইহোক আরো প্রায় ঘণ্টা দুয়েক গল্পগুজব, হাসি ঠাট্টা, খাওয়া-দাওয়ার পর—

সুনন্দা, তুমি ময়নাকে নিয়ে কবে আমাদের ওখানে আসছো?

ভারতীদি, এখন ময়না একদিন তোমাদের ওখান থেকে ঘুরে আসুক। ময়নার বাবা ফিরলে আমি নিশ্চয়ই যাব।

ঠিক তো?

হ্যাঁ, ভারতীদি, সত্যি আমি যাব।

শিবানী বলেন, ভারতী, তোমার মেয়েকে কিন্তু আমাদের ওখানে সারাদিন

কাটাতে হবে। সন্ধ্যের পর আমরাই ওকে পৌঁছে দিয়ে যাব।

না, না, তার দরকার হবে না।

দুর্বা একটু হেসে বলে, মাসীমা, আমার দুই বন্ধু সল্টলেকে থাকে। আমি তো একলাই ওদের ওখানে যাতায়াত করি।

ভারতী বলেন, দুর্বা, তুমি কবে যাবে আমাদের ওখানে?

আমি তো এখন বেকার। যেদিন বলবেন, সেইদিনই যেতে পারি কিন্তু উইক ডে-তে তো আপনাদের কলেজ আছে।

সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। তুমি পরশু যেতে পারবে?

হ্যাঁ, পারবো।

তাহলে ঠিক ন'টার মধ্যে আমি বা শিবানী এসে তোমাকে নিয়ে যাব।

মাসীমা, প্লীজ, আপনাদের কাউকে....

প্লীজ ডোন্ট আর্গু দুর্বা! আমি বা শিবানী এসে তোমাকে নিয়ে যাব, দ্যাটস ফাইন্যাল।

দুর্বা শুধু হাসে।

ওরা দু'জনেই সুনন্দার দুটি হাত ধরে বলেন, তোমাদের কাছে এসে সত্যি খুব আনন্দ পেলাম।

তোমাদেরও আমার খুব ভাল লেগেছে।

দুর্বাকে দু'জনেই বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আদর করলেন, স্নেহচুম্বন দিলেন কপালে।

দুর্বাও ওদের প্রণাম করে।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে একটু এগুতে না এগুতেই ভারতী এক গাল হেসে বলেন, হ্যারে শিবানী, কেমন লাগলো দুর্বাকে?

এত ভাল লেগেছে যে মুখে বলতে পারব না। তুই ঠিকই বলেছিলি ; সত্যি মনে হলো, ঈশ্বর যেন নিজের হাতে খোদাই করে ওকে গড়েছেন।

দুই

শিবানীর সঙ্গে পরামর্শ করেই ভারতী ঠিক করেছিলেন, আরো কিছুদিন না গেলে স্বামী বা ছেলেকে কিছু জানাবেন না। ওরা যাতে কোনকিছু জানতে না পারে, সেজন্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও হয়েছিল শিবানীর বাড়িতে।

তবে হ্যাঁ, ভারতী নিশ্চয়ই দুর্বাকে নিজের বাড়ি ঘুরিয়ে দেখাবেন।

দুই বন্ধু আলাপ-আলোচনা করেই ঠিক করেছিলেন, বাবাই বা ওর বাবা বাড়ি ফেরার আগেই ওরা দুর্বাকে নিয়ে রওনা হয়ে যাবেন।

সেদিন শিবানী ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হতেই দুর্বা হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে

বলল, মাসীমা, আমি রেডি চটি বদলেই আসছি।

সুনন্দাও বেরিয়ে এলেন। বলেন, একি, তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?

না, ভাই সুনন্দা, এখন আর বসব না।

তাই বলে, একেবারে দরজা থেকেই চলে যাবে?

ঠিক সেই সময় দুর্বা বেরিয়ে এসে বলল, মা, আসছি।

শিবানী একটু হেসে বলেন, সুনন্দা, চিন্তা করো না। তোমার মেয়েকে ঠিক সময়েই ফিরিয়ে দিয়ে যাবো।

তোমাদের ওখানে যাচ্ছে, চিন্তা করব কেন?

শিবানী আর দুর্বা ট্যাক্সিতে উঠে বসতেই সুনন্দা হাসতে হাসতে বলেন, শিবানী, ঘটকালি করার ব্যাপারটা ভুলে যেও না।

উনিও হাসতে হাসতে বলেন, মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। সে দায়িত্ব তো আমি স্বেচ্ছায় নিজের হাতে তুলে নিয়েছি।

বাইপাস দিয়ে ট্যাক্সি ছুটছে। কিছু কুন্তল রাশি উড়ে পড়ছে দুর্বার মুখে কিন্তু সেদিকে ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। খোলা জানলা দিয়ে দূরের আকাশ দেখতে দেখতেই ও একটু হেসে বলে, জানেন মাসীমা, আমার খুব ইচ্ছে করে গাড়ি নিয়ে সারা দেশ ঘুরে বেড়াতে আর প্রাণভরে প্রকৃতি দেখতে।

ও সঙ্গে সঙ্গে একটু চাপা গলায় গেয়ে ওঠে

আকাশে আজ কোন্ চরণের
আসা-যাওয়া
বাতাসে আজ কোন্ পরশের
লাগে হাওয়া...।

শিবানী অপলক দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলেন, শিল্পী, তোমাকে যত দেখছি, তত বেশি ভাল লাগছে।

দুর্বা চাপা হাসি হেসে বলে, আপনি কি সত্যি সত্যিই আমার নাম রাখলেন শিল্পী?

তোমাকে তো আর কেন নামে ডাকা যায় না।

ট্যাক্সি থামার আওয়াজ শুনেই ভারতী ভিতর থেকে বেরিয়ে আসেন। দুর্বা ট্যাক্সি থেকে নামতেই উনি ওকে জড়িয়ে ধরে বলেন, তোমার মুখখানা দেখার জন্য কখন থেকে হা করে জানলার ধারে বসে আছি।

শিবানী ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়েই ওদের দু'জনের হাতে ধরে বলেন, এখন ভিতরে চলো তো।

ড্রইং রুমে পা দিয়েই সামনের ছবিটা দেখে দুর্বা বলে, মাসীমা,এই ভদ্রলোকের ছবিতে মালা দেওয়া কেন? আজ কী ওনার জন্মদিন?

শিবানী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, না, শিল্পী, আজ ওনার জন্মদিন না। আমি রোজই এই ছবিতে মালা দিই।

কেন?

দুর্বা যেন জিভ ফসকে প্রশ্ন করে।

ভারতীও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, দুর্বা, আমার এই দেওর বহুকাল আগেই আমাদের সবাইকে ফেলে চলে গেছে।

ছবি দেখে তো মনে হচ্ছে, উনি নেহাতই ইয়ং ম্যান। উনি কবে মারা গিয়েছেন?

ভারতীই ওর প্রশ্নের জবাব দেন, ঠাকুরপো মারা যাবার ঠিক দশ দিন আগে এই ছবিটা তোলা হয়।

ও মাই গড! এত অল্প বয়সে...

শিবানী ওর একটা হাত ধরে বলেন, এখন ভিতরে চলো। পরে সবই জানতে পারবে।

হঠাৎ যেন সুর কেটে যায়, ছন্দ পতন হয়। হাসি উবে যায় তিনজনেরই মুখ থেকে।

দুর্বা যেন নড়তে পারে না। অপলক দৃষ্টিতে আবার ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর খুব আস্তে গেয়ে ওঠে—

তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে
কেউ তা জানে না,
আমার মন যে কাঁদে আপন-মনে
কেউ তা মানে না।
ফিরি আমি উদাস প্রাণে,
তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতন এমন টানে
কেউ তো টানে না।
তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে...

গান হঠাৎ থামিয়ে দুর্বাও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, হ্যাঁ, মাসীমা, চলুন, ভিতরে যাই।

যাইহোক তিনজনে মিলে ব্রেকফাস্ট খাবার পর শিবানীর শোবার ঘরে বিছানার উপরে বসার পর পরই দুর্বা প্রশ্ন করে, মেসোমশাই কত বছর বয়সে মারা যান?

শিবানী বলেন, ও তখন ঠিক একত্রিশ বছরের।

মাত্র একত্রিশ?

হ্যাঁ, মা।

তখন আপনার বয়স কত?

সাতাশ।

ইস! হোয়াট এ স্যাড স্টোরি!

ভারতী বলেন, দুর্বা, তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে, এই সর্বনাশের সময় শিবানী প্রেগন্যান্ট ছিল। মাত্র এক মাস পরই তাতাইয়ের জন্ম হয়।

চমৎকার! ঈশ্বর যে মাঝে মাঝে কি পাগলামীই করেন, তা ভেবে পাই না।

দুর্বা সঙ্গে সঙ্গে শিবানীর একটা হাত দুটো হাতের মধ্যে নিয়ে বলে, মাসীমা, বলুন তো কী করে কাটিয়ে দিলেন এতগুলো বছর।

শিবানী একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, মা, মানুষের সুখ-দুঃখের জন্য কি সময় দাঁড়িয়ে থাকে? সময় ঠিকই এগিয়ে যায় কিন্তু কিছু কিছু স্মৃতি যেন চিরকালের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে থাকে চোখের সামনে।

দু এক মিনিট কেউই কোন কথা বলেন না। সবাই চুপ।

আচ্ছা মাসীমা, মেসোমশায়ের কি হার্ট অ্যাটাক করেছিল?

শিবানী উত্তর দেন না, উত্তর দিতে পারেন না। সেই সর্বনাশের কথা বলতে গেলেই যেন কেউ গলা টিপে ধরে। মুখ দিয়ে একটা শব্দ বের করতে পারেন না।

ভারতী বলেন, মা, এত বছর পরেও সেদিনের অঘটনের কথা বলতে গেলে আমরা নিজেদের সামলাতে পারি না।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, সেদিন সন্ধে সাতটা নাগাদ উডল্যাণ্ডস্ থেকে ঠাকুরপোর কাছে ফোন এলো—

ডক্টর ব্যানার্জী!

কি ব্যাপার ডক্টর চ্যাটার্জী এখন আবার টেলিফোন করছেন কেন?

আর. এম. ও. ডক্টর চ্যাটার্জী বেশ উত্তেজিত হয়েই বলেন, বার্ন স্টান্ডার্ডের ওয়ার্কস ম্যানেজার ফ্যাক্টরীতে সিরিয়াসলি ইনজিয়োর্ড হয়েছেন। আপনি এক্ষুনি চলে আসুন।

ইয়েস আয়াম কামিং।

কাম স্ট্রেট টু ও-টি টু।

ঠিক আছে।

ঠাকুরপো, সারাদিনই প্যান্ট-সার্ট পরে থাকতো ; চেঞ্জ করতো রাত্রে শোবার আগে চান করার পর। যাইহোক এ টেলিফোন আসার দু'মিনিটের মধ্যেই ঠাকুরপো গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

মেসোমশাই কি সার্জেন ছিলেন?

ভারতী একটু হেসে বলেন, ঠাকুরপো অসাধারণ সার্জেন ছিল। এম. বি. বি. এস' এর ফাইনালে সার্জারীতে গোল্ড মেডলিস্ট তারপর শুধু এম. এস. না, ও দ্বিতীয়বার গভর্নরের গোল্ড মেডেল পায়।

ও মাই গড!

দুর্বা মুহূর্তের জন্যে থেমে বলে, যাইহোক সেদিন কী হলো, তাই বলুন।

শিবানী ঠিক রাত বারোটায় ফোন করলো উডল্যান্ডস্-এ ; ওখান থেকে ওরা বলল, ডক্টর ব্যানার্জী অপারেশন শুরু করেছেন ঠিক আটটায়। এখনও অপারেশন চলছে। এখনই বলতে পারছি না, কখন শেষ হবে।

বাবা! তার মানে, খুবই মেজর অপারশেন চলছিল।

হ্যাঁ, খুবই মেজর অপারেশন ছিল।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর ভারতী পাঁজর কাঁপানো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, কি আর বলব মা। উডল্যান্ডস্ থেকে বাড়ি ফেরার পথে হেড লাইট ছাড়া একটা লরীর সঙ্গে ঠাকুরপোর গাড়ি মুখোমুখি ধাক্কায়...

না, উনি কথাটা শেষ করতে পারেন না।

দুর্বা আঁতকে ওঠে, কি সর্বনাশ!

ও তাকিয়ে দেখে দুই মাসীমার চোখেই জল।

দুর্বা আঁচল দিয়ে ওদের দু'জনের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলে, এত বছর ধরেই তো আপনারা চোখের জল ফেলছেন। আজ আর চোখের জল ফেলবেন না। আমি কারুর চোখের জল দেখলে নিজেকে সামলাতে পারি না।

শিবানী সঙ্গে সঙ্গেই একটু কষ্ট করেই হেসে বলেন, না, শিল্পী, আজ আর আমরা চোখের জল ফেলব না। তোমাকে কি আমরা কষ্ট দিতে পারি?

দুর্বা দু'হাত দিয়ে ওদের দুজনের দুটো হাত ধরে বলে, তাহলে শুনুন...

হ্যাঁ, ও গেয়ে ওঠে—

দুঃখ যদি না পাবে তো
দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে?
বিষকে বিষে দাহ দিয়ে
দহন করে মারতে হবে।
জ্বলতে দে তোর আগুনটারে
ভয় কিছু না করিস তারে,
ছাই হয়ে সে নিভবে যখন
জ্বলবে না আর কভু তবে।
এড়িয়ে তারে পালাস না রে,
ধরা দিতে হোস না কাতর্।
দীর্ঘ পথে ছুটে ছুটে

দীর্ঘ করিস দুঃখটা তোর।
মরতে মরতে মরণটারে
শেষ করে দে একেবারে,
তারপরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে।
দুঃখ যদি না পাবে তো...

শিবানী দুর্বার গাল টিপে আদর করে একটু হেসে বলেন, রোজ যদি তোমার কাছে একটা গানও শুনতে পারতাম, তাহলে আর কোনদিন চোখের জল ফেলতাম না।

মাসীমা, রোজ হয়তো পারব না কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি, মাঝে মাঝেই আমি আপনাকে গান শোনাব। প্লীজ, আপনি আর চোখের জল ফেলবেন না।

ভারতী ঠিক সেই সময় গলা চড়িয়ে বলেন, সারদা, আমাদের তিন কাপ কফি দেবে?

রান্নাঘর থেকেই সারদা জবাব দেয়, হ্যাঁ, বড়মা, দিচ্ছি।

একটু পরেই সারদা কফি দিয়ে যায়।

কফি খেতে খেতেই দুর্বা শিবানীর দিকে তাকিয়ে বলে, আপনারা দু'জনে কী আপন বোন? নাকি....

শিবানী ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই চাপা হাসি হেসে বলেন, এই ভারতী, তুই শিল্পীকে বল আমরা কি রকম বোন।

ভারতীও চাপা হাসি হেসে বলেন, আমরা আপন বোনও না, জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো বোনও না।

দুর্বা যেন বিশ্বাস করতে পারে না। অবাক হয়ে বলে,তবে?

ভারতী বলে যান, আমি বেথুন কলেজে চাকরি পাবার ঠিক পাঁচ বছর পর শিবানী ওখানে জয়েন করে। কি করে যে বছর খানেকের মধ্যেই আমাদের দু'জনের বন্ধুত্ব হয়ে গেল, তা বলতে পারব না।

দুর্বা হাসে ; বলে, তারপর?

রোজ কলেজ ছুটির পর আমরা ঘণ্টাখানেক আড্ডা না দিয়ে বাড়ি যাই না।

রোজ?

হ্যাঁ, রোজ।

কি এত কথা বলতেন?

দু'জনে দু'জনের মনের কথা, সংসারের কথা ছাড়াও কত কি বিষয়ে আমাদের কথা। এইভাবে বছর খানেক কাটার পরই আমাদের দু'জনের বাড়ি নিয়ে সমস্যা শুরু হলো।

বাড়ি নিয়ে সমস্যা মানে?

তখন আমরা দু'জনেই ভাড়া বাড়িতে থাকি। দুজনেই বাড়িওয়ালার জন্য নিত্য অশান্তি ভোগ করি।

অশান্তি কেন?

শিবানীদের বাড়িওয়ালার বাতিক ছিল, উনি নিজে সদর দরজা বন্ধ না করে কিছুতেই শুতে যাবেন না। অথচ ঠাকুরপো তখন সবে এস. এস. পাশ করে কর্মজীবন শুরু করেছে।

ভারতী একটু থেমে বলেন, তখন ঠাকুরপো নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ছোট-বড় সব ধরনের অপারেশন করার জন্য অনেকগুলো নার্সিং হোমে যায়। ওর ফিরতে রোজ রাত হতো। আর তাই নিয়েই বাড়িওয়ালা শুরু করতেন অশান্তি।

আচ্ছা লোক তো!

ভাড়া বাড়িতে থাকার যে কি জ্বালা, তা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।

আপনাদের বাড়িওয়ালা কি নিয়ে অশান্তি করতেন?

আমাদের বাড়ির মালিক ছিলেন দুই ভাই। ওদের দু'জনের জাতাকলে পড়ে আমাদের ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা।

কেন?

এক ভাই নিয়মিত টাকা অ্যাডভান্স নিতেন আর অন্য ভাই আমাদের তাড়াবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিলেন।

আচ্ছা মজার ব্যাপার।

শিবানী বলেন, হ্যারে ভারতী, সব ডিটেলস্-এ বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে।

না, না, ডিটেলস্-এ বলব না।

ভারতী একটু থেমেই আবার শুরু করেন, আমরা এর মধ্যে এর-ওর বাড়ি যাতায়াত শুরু করেছি। দুটো পরিবারের মধ্যে বেশ মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যাইহোক আমরা দু'জনে ঠিক করলাম, যেভাবেই হোক আমাদের নিজেদের বাড়ি করতে হবে। বাড়িওয়ালাদের জ্বালাতন-খামখেয়ালীপনা আর সহ্য করব না।

আচ্ছা।

হ্যাঁ, আমরা দু'জনে মন্ত্রী আর কয়েকজন অফিসারদের কাছে যাতায়াত করতে করতে শেষ পর্যন্ত সল্টলেকের এই দুটো জমি পেলাম।

দুই মেসোমশাই নিশ্চয়ই খুব খুশি হলেন?

ভারতী একটু হেসে বলেন, তুমি শুনলে অবাক হবে জমির কথা ওদের আমরা কিছু জানাইনি।

শিবানী বলেন, আমরা দু'জনে তো সংসারে টাকা দিতাম না। সুতরাং ব্যাঙ্কে

বেশ টাকা ছিল। ভারতী নিজের টাকাতেই জমি কিনতে পারলেও আমার টাকা কম পড়লো। কিছু টাকা ভারতী দিল আর কিছু টাকা কলেজ থেকে অ্যাডভান্স নিলাম।

ভেরি ইন্টারেস্টিং।

তারপর ঠাকুরপো আর আমার কর্তাকে রাজি করিয়ে সবাই মিলে পুরী গেলাম। ওখানে গিয়ে ওদের দু'জনকে আমাদের জমির দলিল দেখাতেই ওরা চমকে গেল।

তারপর আপনারা বাড়ি বানালেন?

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত অনেক কাণ্ড করে আমাদের দুটো বাড়ি হলো।

শিবানী বলেন, তবে বাড়ি তৈরি হয়েছে শুধু দাদার জন্য। সব ঝক্কি-ঝামেলা উনি একলা হাতে সামলেছেন।

ভারতী এক ঝলক বন্ধুকে দেখে নিয়েই চাপা হাসি হেসে দুর্বাকে বলেন, এবার একটা মজার কথা বলব?

হ্যাঁ, বলুন।

নিজেদের নতুন বাড়িতে আসার আনন্দে এক বছরের মধ্যেই শিবানীর পেটে তাতাই এলো।

দুর্বা হো হো করে হেসে ওঠে।

শিবানী কোন মতে হাসি চেপে বলেন, আচ্ছা ভারতী, তোর কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই?

এইসব হাসি-ঠাট্টা থামার পর শিবানী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, জানো শিল্পী, দাদা আর ভারতী আমার পাশে না থাকলে এই মহা সর্বনাশের পর আমি ঠিক আত্মহত্যা করতাম। দাদা যে আমাকে কি স্নেহ করেন, তা তুমি কল্পনা করতে পারবে না।

ভারতী একটু হেসে বলেন, আমার স্বামীকে আমি একটা কথা হাজার বার বললেও উনি কানে তোলেন না। সব ব্যাপারেই উনি নির্বিকার ভোলানাথ কিন্তু বৌমা যদি একটা কথা একবার বলে, তাহলে ভোলানাথ সে কাজ না করে শান্তি পান না।

তুই সব সময় দাদাকে ভোলানাথ ভোলানাথ বলবি না তো! দাদার মত মানুষ দশ-বিশ লাখে একটা হয় না, তা জানিস?

শিবানী একটু অভিমান করেই বলেন।

ভারতী হঠাৎ বেশ গম্ভীর হয়ে বলেন, আচ্ছা বাবা, তোর দাদাকে আর ভোলানাথ বলব না। হয়েছে তো?

দুর্বা শুধু হাসে।

খেতে বসার আগে শিবানী বলেন, শিল্পী, চল, তোমাকে আমার বাড়ি দেখাই।

হ্যাঁ, মাসীমা, চলুন।

প্রথম ঘরটায় ঢুকতে না ঢুকতেই ভারতী বলেন, দুর্বা, এটা ছিল ঠাকুরপোর ঘর।

দুর্বা চারদিকে তাকিয়ে দেখে। যাঁকে আর কোনদিন কেউ কাছে পাবে না, সব দেয়ালে শুধু তাঁরই ছবি। শুধু একটা ছবির নচে লেখা আছে—ডাঃ তপোব্রত বন্দোপাধ্যায়। তার নীচে দুটি সন-তারিখ-জন্মদিন আর মৃত্যুদিন।

দুর্বা দু'চোখ ভরে ছবিগুলো দেখতে দেখতে বলে, কি সুন্দর দেখতে ছিলেন মেসোমশাই।

দুর্বা, ঠাকুরপো শুধু দেখতে সুন্দর ছিল না, অসাধারণ ভাল সার্জেন ছাড়াও ওর স্বভাব-চরিত্রের কোন তুলনা ছিল না।

ভারতী মুহূর্তের জন্য থেমেই একটু হেসে বলেন, কিছুদিন পর তাতাই এই ঘরে বসবে।

হঠাৎ দুর্বা মুখ ঘুরিয়ে ভারতীর দিকে তাকিয়ে বলে, তাতাই এই মাসীমার ছেলে?

হ্যাঁ।

আর বাবাই কে?

শিবানী এক গাল হেসে বলেন,আমাদের দু'জনের পেটে একটা করে ছেলে হলেও আমরা দু'জনেই দুটো ছেলের মা।

শুনে দুর্বা খুশির হাসি হাসে। তারপর বলে, আপনাদের দুটো ছেলে কী করছেন? পড়াশুনা নাকি...

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শিবানী চোখ দুটো বড় বড় করে বলেন, বাবাইসোনা দারুণ ছেলে। কানপুর আই-আই-টি থেকে অসাধারণ ভাল রেজাল্ট করে এম. টেক পাশ করে...

ও বাবা! তার মানে খুবই ভাল ছেলে।

হ্যাঁ, শিল্পী, ও সত্যি খুব ভাল ছেলে।

শিবানী মুহূর্তের জন্য থেমেই বলেন, ছেলেটা এখন এত ভাল চাকরি করছে, থলি ভর্তি টাকা আয় করছে কিন্তু কোন চালিয়াতিও নেই, কোন উচ্ছ্বাসও নেই।

ভারতী একটু হেসে বলেন, আমার স্বামীর মত বাবাইও আরেক ভোলানাথ হয়েছে।

মাসীমা, ওকথা বলবেন না। আজকাল বহু ছেলেমেয়েই লেখাপড়ায় ভাল রেজাল্ট করে খুব ভাল চাকরি করছে কিন্তু তাদের অনেকেরই স্বভাব-চরিত্র দেখে অবাক হতে হয়।

ও প্রায় না থেমেই বলে, আপনারা ভাবতে পারবেন না, ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ই অনেক ছেলেমেয়ে শুধু ড্রিঙ্ক করে না, আরো অনেক কিছু করে।

ভারতী বলেন, হ্যাঁ, সেইরকমই তো শুনতে পাই।

শিবানী বলেন, আমাদের ভাগ্য ভাল,আমাদের ছেলে দুটো সেরকম হয় নি।

আচ্ছা মাসীমা, আপনাদের তাতাইসোনা কি করছেন?

ভারতীর দুটো চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলেন, বাবাই সোনা ঠিক ঠাকুরপোর মতই অসাধারণ সার্জেন হতে চলেছে।

আচ্ছা!

ও এত ভাল ছেলে যে একই সঙ্গে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ আর দিল্লির এ-আই-আই-এম-এস' এ এম. বি. বি. এস-এ চান্স পায়। তাতাই সোনা কলকাতায় না পড়ে দিল্লী চলে যায়। ওখানে এম. বি. বি. এস পড়ে এখন এম. এস. করছে।

দুর্বা একটু হেসে বলে, তার মানে উনিও সার্জারীতে খুব ভাল?

ভারতী বেশ গর্বের সঙ্গেই বলেন, তাতাই সোনা বিখ্যাত সার্জেন হতে বাধ্য।

দুই ছেলের জন্যই আপনারা গর্ব করতে পারেন।

শিবানী বলেন, ছেলেদের জন্য ঠিক গর্ব করি না কিন্তু আমাদের নিশ্চয়ই ভাল লাগে।

ভারতী বলেন, তাতাই সোনার মত প্রাণবন্ত ছেলে হয় না। ও যখন এখানে আসে, ও যে আমাদের সবাইকে নিয়ে কি পাগলামী করে, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

তাই নাকি?

আমাদের কথা তো ছেড়েই দিলাম, ও আমার বুড়ো ভোলানাথকে নিয়ে যে কখন কোথায় যাবে, তার ঠিক ঠিকানা নেই।

শিবানী হাসতে হাসতে বলেন, তাতাই গতবার ছুটিতে এসে কি কাণ্ড করেছিল, তা শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

উনি কি করেছিলেন?

ও দাদাকে নিয়ে বেরুবার সময় বলল, মা, আমি জেঠুকে নিয়ে একটু ঘুরে আসছি। আবার হাওড়া স্টেশন থেকে ফোন করে বলল, মা, আমরা পুরী যাচ্ছি; ক'দিন পর ফিরব।

দুর্বা হাসতে হাসতে বলে, আচ্ছা ছেলে তো!

অন্য একটা ঘরে পা দিয়েই শিবানী বলেন, এটা ছেলের ঘর।

মাসীমা, তা আর বলে দিতে হবে না। দেয়ালের পোস্টারগুলো দেখেই বুঝতে পারছি।

ভারতী বুক শেলফ-এর উপর থেকে একটা ছবি তুলে দুর্বার হাতে দিয়ে বলেন, এই দেখো, আমাদের ছেলেদের ছবি।

আপনাদের দুটো ছেলেই তো বেশ দেখতে।

হ্যাঁ, তা বেশ দেখতে।

শিবানী আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলেন, এই হচ্ছে বাবাই সোনা আর এই হচ্ছে...

ওনার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দুর্বা একটু হেসে বলে, তাতাই সোনা, তাইতো?

হ্যাঁ, মা।

চোখ দুটো দেখলেই মনে হয়, আপনাদের তাতাই সোনা বেশ দুষ্টু আছে।

ভারতী আর শিবানী প্রায় একই সঙ্গে বলেন, ঠিক ধরেছ।

ভারতী হাসতে হাসতেই বলেন, ছেলেটা দেখতে দেখতে কত বড় হলো, এম. এস. পড়ছে কিন্তু এখনও বাচ্চাদের মত দুষ্টমি করতে ওর-জুড়ি নেই।

খেতে বসেও কত কথা, কত গল্প হয়। খাওয়া দাওয়ার পরও কত কথা হয় ওদের।

একবার দুর্বা ভারতীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, মেসোমশাই কি করেন?

ভারতী একটু হেসে বলেন, উনি একটু বড় ধরনের মিস্ত্রিগিরি...

ওনাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই শিবানী বলে, চুপ কর ভারতী। দাদা মিস্ত্রিগিরি করেন, তাই না?

এবার উনি দুর্বার দিকে তাকিয়ে বলেন, দাদা গেস্ট-কিন-উইলিয়ামস্-এর চীফ ম্যানেজার-প্ল্যানিং।

তার মানে মেসোমশাই ইজ এ বিগ বস!

শিবানী সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করেন, শিল্পী, তোমার বাবা কি করেন?

বাবা মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার। এখন চীফ জেনারেল ম্যানেজর-ওয়ার্কস। তাইতো বাবাকে হরদম দিল্লী আর হায়দ্রাবাদ ছুটতে হয়।

তার মানে তোমার বাবা বেশ কৃতি পুরুষ।

কৃর্তি পুরুষ কিনা জানি না কিন্তু হি ইজ রিয়লী এ ভেরি গুড ম্যান, এ চামিং হাসব্যান্ড অ্যান্ড লাভলি অ্যাফেকশনেট ফাদার।

বেলা গড়িয়ে যায় ; সূর্য ঢলে পড়ে। কফি খেতে খেতে ভারতী বলেন, শিবানী, চল, আমরা দু'জনে গিয়ে দুর্বাকে পৌঁছে দিই।

দুর্বা কফির কাপে চুমুক দিতে গিয়েও দেয় না ; বলে, না, না, আপনাদের কাউকে যেতে হবে না। আমি একলাই যেতে পারব।

নিশ্চয়ই তুমি একলা যেতে পারো কিন্তু আমরাই তোমাকে পৌঁছে দেব।

দুর্বা আবার আপত্তি করে না কিন্তু শিবানী বলেন, আমাদের যদি যেতে ইচ্ছে করে, তুমি আপত্তি করবে কেন?

ও একটু হেসে বলে, আপনারা সব সময় আমাকে হারিয়ে দিচ্ছেন।

এর পর তুমি আমাদের বার বার হারিয়ে দিও।

রওনা হবার আগে ভারতী বলেন, চলো দুর্বা, আমার বাড়িটা দেখবে।

হ্যাঁ, মাসীমা, চলুন।

বাড়িটা দেখে বেরুতে বেরুতেই দুর্বা বলে, আপনাদের দুটো বাড়িতেই কোন

বাহুল্য নেই। আজকাল অনেক বাড়িতেই এমন দামী দামী আর চকমকে-ঝকঝকে ফার্নিচার রাখে যে মনে হয়, কোন হোটেলে এসেছি।

মা, আমরা আবার কি বাহুল্য করব?

মাসীমা, আজকাল বহু বাড়িতেই লক্ষ্মী-সরস্বতী বিরাজ করেন কিন্তু সেই সব বাড়িতে রুচির পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না।

হ্যাঁ, তা বলতে পারো।

ট্যাক্সি ধরার জন্য ওরা তিনজনে মোড়ের মাথার দিকে এগিয়ে চলেন।

শিবানী বলেন, শিল্পী, এই দুই বুড়ীর সঙ্গে সারাটা দিন কাটিয়ে কেমন লাগলো, তা তো বললে না।

মাসীমা, বিশ্বাস করুন, খুব ভাল লেগেছে, খুব আনন্দ পেয়েছি।

দুর্বা না থেমেই হাসতে হাসতে বলে, দেখবেন, এবার থেকে যখন-তখন আপনাদের কাছে এসে যাবো।

ওরা দু'জনেই এক সঙ্গে বলেন, হ্যাঁ, মা, এসো খুব খুশি হবো।

তিন

সকালে সংসারের টুকটাক দেখাশুনা বিধি ব্যবস্থা ছাড়াও খেয়েদেয়ে কলেজ যেতে হয়। তাছাড়া সল্টলেক থেকে বেথুন কলেজ যেতেও বেশ সময় লাগে। কোন কোনদিন তো ট্যাক্সিতেও ওদের যেতে হয় ঠিক সময়ে পৌঁছবার জন্য। তাই ইচ্ছা থাকলেও সময় হয় না।

তাছাড়া আরো একটা ব্যাপার আছে।

এতো গ্যাস সিলিন্ডার পাঠাবার জন্য ফোন করা না যে কনজিউমার নাম্বার বলে দিলেই কথা বলা শেষ। দুর্বা আর সুনন্দার সঙ্গে কথা বলতে হলে হাতে বেশ একটু সময় চাই। ওদের সঙ্গে কথা বলা শুরু করলে তো দু-পাঁচ মিনিটে শেষ করা যায় না। তাছাড়া ইচ্ছাও করে না অত তাড়াতাড়ি রিসিভার নামিয়ে রাখতে।

কথা হয় সন্ধ্যের পর এবং সব সময় শিবানীর বাড়ি থেকে। সুব্রতবাবু ও বাবাই এখনই যেন কিছু সন্দেহ করতে না পারে, তার জন্যও সতর্ক থাকতে হয়।

হ্যালো।

মাসীমা, আমি আপনার শিল্পী।

দুর্বা হাসতে হাসতেই বলে।

শিবানীও হাসতে হাসতে বলেন, এক্ষুনি ভারতী ঘরে পা দিয়েই বলছিল, হ্যারে, দুর্বাকে ফোন কর। আমি বললাম, এই চিঠিটা পড়েই ফোন করছি।...

চিঠি পড়া শেষ হয়েছে নাকি...

চিঠি পড়ার পর তোমাকে যেই ফোন করতে যাচ্ছি, ঠিক তখনই টেলিফোন রিং বাজলো।

দেখেছেন মাসীমা, কি রকম টেলিপ্যাথি। যে মুহূর্তে আপনারা আমার কথা...

হ্যাঁ, মা, তাইতো দেখছি।

শিবানী মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, তুমি একটু ভারতীর সঙ্গে কথা বলো। তা নয়তো ও এখুনি আমার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করবে।

দুর্বা একটু হেসে বলে, আপনারা জীবনে কখনও ঝগড়া করেছেন?

ন, করিনি কিন্তু এখন তোমার সঙ্গে একটু বেশি কথা বললেই ও ঠিক ঝগড়া করবে।

শিবানী থামেন, শুরু করেন ভারতী।

দুর্বা, তুমি তো সেদিন দেখেছ শিবানীর হ্যান্ড ফ্রী সেট।

হাঁ, মাসীমা, দেখেছি।

তাই বলছি, তোমার সব কথাই শুনেছি। সত্যি বলছি, এই সন্ধ্যের পর তো আমাদের দুজনের হাতেই প্রচুর সময়। তাই তোমার সঙ্গে কথা না বলে আমরা থাকতে পারি না।

শিবানী ওদের কথার মাঝখানেই বলেন, তোমার সঙ্গে কথা বলা আমাদের নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে।

দুর্বা বলে, রোজ আপনাদের সঙ্গে কথা না বললে আমারও একদম ভাল লাগে না।

ভারতী চাপা হাসি হেসে বলেন, তার মানে এই দুই বুড়ীকে তোমার একটু একটু ভাল লেগেছে?

একটু একটু মানে? দারুণ ভাল লেগেছে। আপনারা দু'জনেই যেমন চার্মিং আর গ্রেসফুল, সেইরকমই অ্যাফেকশনেট। ভাল না লেগে পারে?

কিন্তু তুমি তো আমাদের দু'জনকে একেবারে হিপানোটাইজ করেছ।

দুর্বা একটু জোরেই হেসে ওঠে। বলে, আমি কী পি. সি. সরকার যে আপনাদের হিপানোটাইজ করব?

না, মা, তুমি পি. সি. সরকার না ; তোমার রূপ-গুণ-স্বভাব-চরিত্র আমাদের মুগ্ধ করেছে।

অত বললে ঠিক আমার অহংকার হবে।

আচ্ছা সুনন্দা কি করছে?

বাবা তো এখানে নেই। সুতরাং মা নিশ্চয়ই টি.ভি.তে সিরিয়াল দেখছে। সময় তো কাটাতে হবে।

সত্যিই তো ওকে সময় কাটাতে হবে।

মা দুপুরে একদম ঘুমুতে পারে না। সারা দুপুর গল্প-উপন্যাস পড়ে বলে সন্ধের পর আর পড়তে চায় না।

ঠিকই তো। সব সময় কি পড়তে ভাল লাগে?

বাবা কলকাতায় থাকলে কথায়-বার্তায় মা-র সময় কেটে যায় কিন্তু বাবা দিল্লী বা হায়দ্রাবাদ গেলেই...

সিরিয়াল দেখা শেষ হলে সুনন্দা যদি পারে তাহলে যেন একবার ফোন করে। চার-পাঁচদিন ওর সঙ্গে কথা হয় নি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মা ঠিকই ফোন করবে।

হ্যাঁ, কিছুক্ষণ পরে সুনন্দাও ফোন করেন।

কী হলো? আমাদের দাদা এখানে নেই বলে টি. ভি. দেখছিলে?

কী করব বলো শিবানীদি? তোমাদের দাদা থাকলে তবু ঝগড়া-টগড়া করে বেশ সময় কেটে যায় কিন্তু...

বাজে কথা বলো না। দাদার সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়, এই কথা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে?

তোমাদের দাদা কি এমন মহাদেব যে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া হবে না?

শিবানী হাসতে হাসতে বলেন, সুনন্দা, শাঁক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করো না। দাদার কথা বলার সময় এখনও তো নতুন বউদের মত লজ্জায় তোমার সারা মুখ লাল হয়ে যায়।

ওনার কথায় সুনন্দা হো হো হেসে ওঠেন। বলেন, সত্যি তোমরা কলেজে প্রফেসরী করো বলে কত আজেবাজে কথাও কত সুন্দর করে বলতে শিখেছ দেখছি।

আর কিছু বদনাম দেবে না?

আচ্ছা, আচ্ছা, আর ঝগড়া করো না। এবার বলো ভারতীদি, কি কাছে আছে?

কাছে আছে মানে?

শিবানী মুহূর্তের জন্য চাপা হাসি হেসে বলেন, কাছে আছে মানে? ও তো প্রায় আমার ঘাড়ের উপর চেপে আছে। তোমার বা তোমার মেয়ের সঙ্গে যে এটুকু প্রাইভেট প্রাণের কথা বলব, সে সুযোগও আমার নেই।

সত্যি তোমরা দু'জনে আছো ভাল।

এবার ভারতী বলেন, সুনন্দা, আমাদের দু'জনের তো আর কোনভাবে ভাল থাকার উপায় নেই।

সুনন্দা বলেন, কেন?

ঠাকুরপো তো অনেক দিন থেকে নিরুদ্দেশ আর আমার বুড়ো ভোলানাথ বাড়িতে ফিরেই মুখের সামনে একখানা বই নিয়ে ধ্যানস্থ। তাই...

অমন স্বামী পেয়ে বেঁচে গেলে ভারতীদি।

তাই নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এইভাবেই দিন যায়। কখনো কখনো সময় সুযোগ হলে ভারতী আর শিবানী ওদের ওখানে যান। এই মাস দুয়েকের মধ্যে দুর্বাও দু'বার সল্টলেকে ওদের কাছে এসেছে। তার মধ্যে একদিন সুনন্দাকেও সঙ্গে এনেছিল ; তবে সেদিন ওরা বেশিক্ষণ থাকেনি। লেকটাউনে অসুস্থা ছোট মাসীকে দেখতে গিয়েছিল সুনন্দা মেয়ের সঙ্গে। বাড়ি ফেরার পথে মাত্র ঘণ্টা খানেক ছিল ভারতী আর শিবানীর কাছে।

সেদিনই ভারতী বলেছিলেন, সুনন্দা, আজ নিছকই বুড়ী ছুঁয়ে গেলে। এর পর এসে সারাদিন কাটাবে আমাদের কাছে।

হ্যাঁ, সত্যি, এর পর একবার সারাদিন কাটাবো তোমাদের সঙ্গে।

মনে থাকবে তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে থাকবে।

প্রায় মাস খানেক পরের কথা। সেদিন রবিবার। অন্যান্য রবিবারের মত সেদিনও ভারতী আর শিবানী উল্টোডাঙায় মুচি বাজারে যাবার উদ্যোগ করছেন, ঠিক সেই সময় টেলিফোন।

হ্যালো!

মাসীমা, মা কথা বলবেন।

হ্যাঁ দাও।

সুনন্দা রিসিভার হাতে নিয়ে একটু হেসে বলে, শিবানীদি, আজ একটু চাল বেশি নিও। দুপুরে আমরা দু'জনে যাবো।

সত্যি তোমরা আসছো?

তবে কী ঠাট্টা করছি!

কখন আসবে?

ভাবছি, মোটামুটি, দশটার মধ্যে রওনা হয়ে....

তার মানে এগারোটার মধ্যে আসবে।

হ্যাঁ, তাই মনে হয়।

এসো, এসো, খুব আড্ডা দেওয়া যাবে।

শিবানীদি, এখন রাখছি। একটু পরেই তো দেখা হবে, কী বলো।

কথা শেষ করেই শিবানী জানলার সামনে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে বলেন, এই ভারতী, শিগগির আয়। দারুণ খবর আছে।

এক মিনিটের মধ্যেই ভারতী শিবানীর কাছে এসে বলেন, কী দারুণ খবর আছে রে?

শিবানী কোন মতে হাসি চেপে বলে, তোর ভাবী বেয়ান আর ভাবী পুত্রবধূ আসছে।

সত্যি?

তবে কি তোকে মিথ্যে বলছি?

উনি মুহূর্তের জন্য না থেমেই বলেন, এক্ষুনি সুনন্দা ফোন করে বলল, এগারটার মধ্যে আমাদের এখানে পৌঁছবে।

ভারতী একটু চিন্তিত হয়ে বলেন, আজতো তোর দাদা আর বাবাইও বাড়ি আছে।

শিবানী একটু হেসে বলেন, ভালই তো! আজই সব দেখাশুনা হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক।

আর সময় নষ্ট না করে চল বাজার থেকে ঘুরে আসি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি নন্দকে গাড়ি বের করতে বলছি।

মেয়েকে নিয়ে সুনন্দা গাড়ি থেকে নামতেই ভারতী মুচকি হেসে গলা চড়িয়ে বলেন, এই শিবানী, শাঁখ বাজিয়ে মালা পরিয়ে সুনন্দাকে ঘরে নিয়ে যা।

সুনন্দাও হাসতে হাসতে বলে, ভারতীদি, যদি বেশি বাড়াবাড়ি করো, তাহলে আজ আমি বাড়িই ফিরব না।

শিবানী দুর্বার একটা হাত ধরে বলেন, শিল্পী, চলো, আমরা ভিতরে যাই। ওরা দু'জনে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করুক।

হ্যাঁ, মাসীমা, সেই ভাল।

ওদের পিছন পিছনেই ভারতী সুনন্দাকে নিয়ে ভিতরে যান। সবাই মিলে ড্রইংরুমে বসতেই শিবানী বলেন, সত্যি বলছি ভারতী, তোমরা সারাদিনের জন্য এসেছ বলে খুব ভাল লাগছে। আজ আমরা প্রাণ ভরে আড্ডা দেব।

উনি মুহূর্তের জন্য না থেমেই ঠোঁটের কোনে হাসি লুকিয়ে বলেন, প্রতিদিন শুধু ভারতীর মুখ দেখতে কী ভাল লাগে?

দুর্বা সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত দিয়ে ভারতীর গলা জড়িয়ে ধরে শিবানীর দিকে তাকিয়ে বলে, এমন সুইট আর লাভলি বন্ধুর মুখ দেখতেও ভাল লাগে না?

না।

এক নিঃশ্বাসেই শিবানী বলেন, ওকে দেখতে দেখতে টায়ার্ড হয়েছি বলেই তো তোমার সুন্দর মুখখানা দেখতে চাই।

ভারতীও দুর্বাকে বলেন, জানো মা, দিন রাত্তির শিবানীর মুখ দেখতে আমারও আর ভাল লাগে না। তাইতো তোমাকে একটু দেখার জন্য, কাছে পাবার জন্য চাতকের মত হা করে বসে থাকি।

সুনন্দা সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হাসতে বলেন, এতই যখন আমার

মেয়েকে তোমাদের কাছে পেতে ইচ্ছে করে, তখন তোমরা ওকে রেখে দিচ্ছো না কেন?

ওনার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই ভারতী আর শিবানী এক সঙ্গে বলেন, হ্যাঁ, ওকে আমরা রেখেই দেব।

ওদের কথাবার্তায় দুর্বা লজ্জিত বোধ না করে থাকতে পারে না। ও উঠে দাঁড়িয়ে বলে, মা, আমি ভিতরে যাচ্ছি। তোমরা কথা বলো।

সারদা ট্রেতে চার কাপ কফি এনে ওদের তিন জনের হাতে দিতেই শিবানী বলেন, সারদা, মাসীমাকে প্রণাম করো।

সারদা ওনাকে প্রণাম করতেই সুনন্দা একটু হেসে বলেন, তোমার রান্না খেয়ে আমার মেয়ে তো প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

মাসীমা, আপনার মেয়ে এত ভাল যে রান্না খারাপ হলেও ও প্রশংসা না করে থাকতে পারবে না।

না, সারদা, তা বলো না।

শিবানী বলেন, সারদা, শিল্পী বোধহয় আমার ঘরে আছে। ওকে ওখানেই কফি দাও।

সারদা চলে যায়।

কফির কাপে দু'একবার চুমুক দিয়েই সুনন্দা বলে, শিবানীদি, সত্যি করে বলো তো কোন ছেলের খোঁজ পেলে কিনা।

শিবানী কোনমতে হাসি চেপে একটু গম্ভীর হয়ে বলেন, হাতে উপযুক্ত ছেলে না থাকলে কি সেদিন অত জোর দিয়ে বলতে পারতাম, মেয়ের বিয়ের জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না?

ভারতী কোন কথা বলেন না। মুখের সামনে হাত রেখে হাসি লুকিয়ে রাখেন।

সুনন্দা সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করেন, ছেলেটি আমার মেয়ের উপযুক্ত হবে তো?

তা তো হবেই।

ছেলেটি কত দূর লেখাপড়া করেছে? কি করে?

শিবানী ওনার একটা হাত ধরে বলেন, অত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? পরে সবই বলব, সবই জানবে।

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়েই সুনন্দা বলেন, দেখো শিবানীদি, মেয়েটা এত কাল পড়াশুনা করছিল বলে বিয়ের কথা বিশেষ চিন্তা করিনি কিন্তু ওর এম. এ. পরীক্ষা শেষ হতেই বিয়ের চিন্তায় পাগল হয়ে যাচ্ছি।

উনি না থেমেই একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, তোমরা বিশ্বাস করো, মেয়েকে যতক্ষণ পর্যন্ত ভাল ছেলের হাতে তুলে দিতে না পারছি, ততক্ষণ আমি শান্তিতে...

শিবানী ওনার দুটো হাত ধরে বলেন, প্লীজ, তুমি অত চিন্তা করো না। তোমার

মেয়ে ঠিকই ভাল ছেলের হাতে পড়বে।

হঠাৎ ভারতী প্রশ্ন করেন, আচ্ছা সুনন্দা, কী রকম ছেলের সঙ্গে দুর্বার বিয়ে দিতে চাও?

দেখো ভারতীদি, ছেলেটিকে যে ডাক্তার এঞ্জিনিয়ার বা কলেজের লেকচারার হতেই হবে, তেমন কোন কথা নেই। তবে ময়না স্পষ্ট বলে দিয়েছে, সে আই-এ-এস বা আই-পি-এস ছেলেকে বিয়ে করবে না।

ভারতী আর শিবানী হাসতে হাসতে বলেন, তাই নাকি?

সুনন্দাও একটু হেসে বলেন, আমার মেয়ে তো ওর বাবাকে সোজাসুজি বলে দিয়েছে, যারা পেট মেটা ক্যাবলা চণ্ডী কনস্টেবল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাদের আমি বিয়ে করব না।

ভারতী জিজ্ঞেস করেন, ওর বাবা কি বললেন?

ওর বাবা বললেন, ময়না, ওরাই তো দেশ চালায়।

সুনন্দা না থেমেই হাসতে হাসতে বলেন, আমার মেয়েও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, ওরা দেশ চালাবে চালাক কিন্তু আমাকে চালাবার সুযোগ দেব না।

ভারতী উঠে দাঁড়ায় ; বলেন, শিবানী, তোরা কথা বল। আমি দুর্বার কাছে যাচ্ছি। ও বেচারী অনেকক্ষণ একলা আছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই যা।

ভারতী চলে যেতেই সুনন্দা আবার শুরু করেন।

জানো শিবানীদি, ময়নার বাবার সঙ্গে হায়দ্রাবাদে একজন বাঙ্গালী আই-এ-এস অফিসারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছে। ছেলেটি বুঝি দেখতেও বেশ ভাল আর যথেষ্ট উচ্চ শিক্ষিত।

শিবানী মন দিয়ে ওনার কথা শোনেন।

ছেলেটি আগে দিল্লীর হিন্দু কলেজে লেকচারার ছিল। তারপর এখন সে অন্ধ্র ক্যাডারের আই-এ-এস। ছেলেটির মা লেডি শ্রীরাম কলেজের লেকচারার আর বাবা বেশ নাম করা আর্কিটেক্ট।

তার মানে বেশ ভাল পরিবারের ছেলে।

তা হলে কী হয়? মেয়ে তো ওর বাবাকে সোজাসুজি বলে দিলো...

জানো সুনন্দা, আমাদের বেথুনে অনেক আই-এ-এস আর আই-পি-এস এর মেয়ে পড়ে ; এই সব মেয়েদের প্রায় সবারই বিয়ে হচ্ছে আই-এ-এস বা আই-পি-এস ছেলেদের সঙ্গে কিন্তু অন্য মেয়েরা এসব ছেলেদের বিয়ে করতে বিশেষ আগ্রহী না।

হ্যাঁ, আমিও মেয়ের কাছে সেইরকমই শুনি।

শিবানী একটু হেসে বলেন, আমিও তোমার মেয়ের জন্য কোন আই-এ-এস বা আই-পি-এস ছেলের কথা ভাবিনি।

ভাই, তুমি একটু খুলে বলো না, কোন ছেলের কথা ভেবে তুমি আমাকে আশ্বস্ত করেছ?

যে ছেলেটির কথা ভাবছি, সে সত্যি ভাল ছেলে। যেমন রূপ, তেমনই তার গুণ।

ছেলেটির স্বভাব-চরিত্র ভাল তো?

হ্যাঁ, ভাই, সেদিক থেকে তোমার চিন্তার কিছু নেই।

শিবানী না থেমেই বলেন, ছেলেটিকে আমি একেবারে ছোটবেলা থেকেই দেখছি। তাইতো জোর গলায় বলতে পারি, ওর মতো ভাল ছেলে আজকাল বিশেষ দেখা যায় না।

বাঃ! খুব ভাল কথা।

সুনন্দা সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, ওদের কি খুব বড় সংসার? অনেক ভাই-বোন?

শিবানী একটু হেসে বলেন, না ; ঐ ছেলেটিই মা-বাবার এক মাত্র সন্তান।

ছেলেটির মা-বাবা কেমন মানুষ?

আমার তো খুবই ভাল লাগে। আমার বিশ্বাস, তোমার মেয়ে ওদের চোখে মণি হয়ে থাকবে।

সুনন্দা সঙ্গে সঙ্গে ওনার দুটি হাত ধরে বলেন, প্লীজ, তুমি ছেলেটিকে দেখার ব্যবস্থা করো। এই ছেলে আমি কিছুতেই হাতছাড়া হতে দেবো না।

শিবানী সঙ্গে সঙ্গে গলা চড়িয়ে বলেন, এই ভারতী, শিগগির আয়।

ভারতী ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই বলেন, কি হয়েছে যে অমন করে...

আরে, শোন, শোন।

শিবানী হাসতে হাসতেই বলেন, সুনন্দা জানতে চাইলো বলে আমি ছেলেটির বিষয়ে মোটামুটি সব খবরই বললাম।...

কী বললি?

বললাম, ছেলেটির যেমন রূপ, তেমনই গুণ স্বভাব-চরিত্রও ভাল।

আর কী বললি?

আর বললাম, ছেলেটি মা-বাবার একমাত্র সন্তান ; শিল্পী ঐ সংসারে বেশ সুখে-শান্তিতেই থাকবে।

কিন্তু আমাকে ডাকলি কেন?

শিবানী কিছু বলার আগেই সুনন্দা বলেন, আমি ওকে বললাম, ছেলেটিকে দেখাবার ব্যবস্থা করতে।

শিবানী একটু হেসে বলেন, সুনন্দা এই ছেলে হাত ছাড়া করতে চায় না।

ভারতী খুব জোরে একবার নিঃশ্বাস ফেলে একটু হেসে শিবানীকে বলেন, বেশ তো। ছেলেটি যখন হাতে আছে, তখন তুই ওকে দেখাবার ব্যবস্থা করে দিস।

ঠিক সেই সময় 'ও ছোট মা' 'ও ছোট মা' বলে চিৎকার করতে করতে বাবাই এসে হাজির।

ভারতী কোনমতে হাসি চেপে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়েই বলেন, ও সারদা, রান্না হলো?

বাবাই দু'হাত দিয়ে শিবানীর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, ছোট মা, কখন খেতে দেবে? তোমার দাদা আর আমি যে খিদের জ্বালায় মরে যাচ্ছি।

শিবানী দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা ধরে বলেন, হ্যাঁ, বাবাই সোনা, এক্ষুনি খেতে দেব। সত্যি গল্প করতে করতে অনেক...

কথা শেষ না করেই উনি সুনন্দাকে দেখিয়ে বাবাইকে বলেন, বাবাই সোনা, আমাদের বিশেষ বন্ধু সুনন্দাকে প্রণাম করো।

বাবাই ওনাকে প্রণাম করে, সুনন্দা ওকে আশীর্বাদ করেই শিবানীকে বলেন, তোমার ছেলে তোমাকে ছোট মা বলে কেন?

শিবানী গর্বের হাসি হেসে বলেন, হ্যাঁ, ভাই, আমার ছেলে আমাকে ছোট মা বলে।

আলতো করে বাবাইয়ের গাল টিপে উনি বলেন, কি আর বলব! ছেলে ভুল করে ভারতীর পেটে জন্মেছে।

দুর্বা তখনই শিবানীর ঘর থেকে বেরিয়ে ড্রইংরুমের দিকে পা বাড়িয়ে বলে, ও মাসীমা, আবার কার সঙ্গে গল্প শুরু করলেন?

আয় মা, আয়।

দুর্বা কাছে আসতেই শিবানী ওর একটা হাত ধরে বলেন, শিল্পী, এই হচ্ছে আমার ছেলে বাবাই সোনা।

দুর্বা মুহূর্তের জন্য বাবাইকে দেখেই বলে, মাসীমা, ইনি দিল্লী থেকে কবে এলেন?

শিল্পী, যে ছেলে দিল্লী থাকে, সে হচ্ছে তাতাই সোনা।

সরি! সত্যি গণ্ডগোল হয়ে গেছে।

দুর্বা সঙ্গে সঙ্গেই একটু হেসে বলেন, মাসীমা, তার মানে ইনি হচ্ছেন আই-আই-টি'র এম. টেক-ওয়ালা আপনাদের ভেরি ভেরি গুড বয়!

ওর কথা শুনে শিবানীও হাসেন, বাবাই হাসে। কিন্তু সুনন্দা মেয়েকে বুকুনি দেন—এই ময়না, এইভাবে কেউ কথা বলে?

দুর্বা চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, ও মা, সত্যি আমি খারাপ কিছু বলিনি। আমি শুনেছি, ইনি দারুণ ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করে আই-আই-টি থেকে এম. টেক পাশ করেছেন আর অসম্ভব ভাল ছেলে।

শিবানী বলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে।

এবার উনি বাবাইকে বলেন, বাবাই সোনা, এই হচ্ছে সুনন্দার মেয়ে দুর্বা। এত ভাল গান গাইতে পারে যে আমি ওর নাম রেখেছি শিল্পী।

বাবাই কয়েক মুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে ওকে দেখেই একটু হেসে দু'হাত জোড় করে বলে, নমস্কার!

নমস্কার!

দুর্বাও হাসি চেপে কয়েক মুহূর্তের জন্য ওকে দেখে।

শিবানী উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, এই ভারতী, সব রেডি তো? আমি কী দাদাকে ডাকতে যাবো?

ভারতী রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলেন, হ্যাঁ, শিবানী তোর দাদাকে আসতে বল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি।

সুব্রতবাবুকে নিয়ে ড্রইংরুমে পা দিয়েই শিবানী বলেন, সুনন্দা, আমার দাদা।

সুনন্দা প্রণাম করতেই উনি বলেন, থাক, থাক, হয়েছে বৌমার কাছে আপনার আর আপনার মেয়ের কথা প্রায় রোজই শুনি।

দুর্বা একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। শিবানী ওকে টেনে এনে সুব্রতবাবুর সামনে এনে বলে, দাদা, এই আমার শিল্পী।

দুর্বা ওকে প্রণাম করতেই সুব্রতবাবু ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে একটু হেসে বলেন, মা, বৌমার কাছে শুনেছি তুমি অসাধারণ গান গাও।

মাসীমা স্নেহ করেন বলে অনেক বেশি বাড়িয়ে বলেছেন। আমি একটু-আধটু গান গাই ঠিকই কিন্তু অসাধারণ কখনই না।

দেখো মা, আমার বৌমা তো সে ধরনের মেয়ে না। উনি কখনই অহেতুক কিছু বাড়িয়েও বলবেন না, ছোট করেও কিছু দেখাবেন না। বৌমা অসম্ভব ব্যালান্সড্ মেয়ে।

ওনার কথা শুনে সুনন্দাও হাসেন, দুর্বাও হাসে।

সুব্রতবাবু একটু হেসে বলেন, মা, আজ যখন সৌভাগ্যক্রমে তোমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হলো, তখন একটা গান না শুনিয়ে যেও না।

দুর্বা একটু মুখ নীচু করে বলে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই গান শুনিয়ে যাবো।

সবাই মিলে এক সঙ্গে খেতে বসেও কত কথা, কত গল্প আর হাসাহাসি হয়। অন্যরা বুঝতেও পারে না। কিন্তু এইসব গল্পগুজব আর হাসাহাসির মধ্যেই বাবাই মাঝে মাঝেই কয়েক মুহূর্তের জন্য দুর্বার শ্রীমণ্ডিত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কখনও কখনও দুর্বাও ওকে না দেখে পারে না। আবার এরই মধ্যে কয়েকটা দুর্লভ মুহূর্তের জন্য ওদের দু'জনের দৃষ্টি বিনিময় হতেই লজ্জায় ওরা দৃষ্টি গুটিয়ে নেয়।

খাওয়া-দাওয়ার পর সবার মনেই খুশির জোয়ার। আবার সবাই জমায়েত

হন ড্রইংরুমে। সেখানেও আড্ডা জমে যায়।

হঠাৎ সারদা এসে ভারতীকে বলে, ও বড়মা, আপনারা তো কেউ কিছু বলছেন না।

ও একটু হেসে বলে, অন্য রবিবার তা চারটে বাজতে না বাজতে চায়ের জন্য আপনারা অস্থির হয়ে ওঠেন। আর আজ পাঁচটা বাজতে চললো কিন্তু তবু...

দেয়ালে টানানো ঘড়িটার দিকে তাকিয়েই শিবানী হাসতে হাসতে বলেন, সত্যিই তো পাঁচটা বাজতে মাত্র মিনিট দশেক বাকি। যাও, যাও, চটপট কফি করো।

দুর্বা একটু হেসে বলে, দোষ হয় আমাদের মত ছেলে মেয়েদের। আমরা নাকি আড্ডা দিতে বসলে কোনদিকে কোন হুঁস থাকে না কিন্তু আজ দেখলাম, আড্ডায় মেতে গেলে আমাদের গুরুজনদেরও কোনদিকে খেয়াল থাকে না।

ভারতী গম্ভীর হয়ে বলেন, ওরে আদরিণী, আমরা আড্ডা দিই হাজার রকম দায় দায়িত্ব কাজকর্ম মিটিয়ে কিন্তু তোমরা?

দুর্বা সঙ্গে সঙ্গে এক হাত দিয়ে ওনার গলা জড়িয়ে গেয়ে ওঠে–

মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ
জানিস নে কি ভাই।
তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই॥
খেলা মোদের বাঁচা মরা,
খেলা ছাড়া কিছুই কোথাও নাই॥
খেলতে খেলতে ফুটেছে ফুল।
খেলতে খেলতে ফল যে ফলে॥
খেলারই ঢেউ জলে স্থলে।
ভয়ের ভীষণ রক্ত রাগে
খেলার আগুণ যখন লাগে।
ভাঙাচোরা জ্বলে যে হয় ছাই॥
মোদের যেমন খেলা
তেমনি যে কাজ
জানিস নে কি ভাই।

গান শেষ হতেই সবাই হৈ হৈ করে ওঠেন, শুধু বাবাই নীরব। ওর চোখে মুখে খুশি ফুটে উঠলেও মুখে কিছু বলতে পারে না। সুব্রতবাবু দুর্বার দু'টি হাত ধরে বলেন, মা জননী, তোমার মতো মেয়েকে তো ছেড়ে থাকা মুস্কিল।

শিবানী এক মুহূর্তের জন্য ভারতীর দিকে তাকিয়েই বলেন, দাদা, ছেড়ে থাকা মুসকিল মানে? আপনি কি অবিবাহিতা দুর্বাকে আটকে রাখবেন?

হ্যাঁ, বৌমা, ওকে আটকে রাখবো তোমাদের বাবাইসোনার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে।

ওনার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই বাবাই আর দুর্বা ছিটকে বেরিয়ে যায় ওখান থেকে।

সুনন্দা সুব্রতবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলেন, দাদা, আপনি যে আজ আমাকে কি নিশ্চিন্ত করলেন, তা বলতে পারবো না। শুধু কায়মনোবাক্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ময়না যেন আপনাদের সবাইকে সুখী করতে পারে।

বৌমা, আপনার মেয়েকে...

দাদা, দয়া করে আপনি বলবেন না। আমি তো শিবানীদিরই বয়সী।

আচ্ছা, আচ্ছা, তুমিই বলব।

উনি একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলেন, বৌমা, মেয়েকে দেখে আর কথাবার্তা বলে যদি সত্যি আনন্দ আর শান্তি না পেতাম, তাহলে কি আমি ওকে মা জননী বলতাম?

এবার উনি সুনন্দার মাথায় হাত দিয়ে বলেন, বৌমা, আমার মা জননী আমাদের কাছে সুখে শান্তিতেই থাকবে। কোন চিন্তা নেই।

ভারতী আর শিবানী আনন্দে খুশিতে দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরেন আর শুধু হাসেন।

হঠাৎ শিবানী ওনাকে ছেড়ে দিয়েই সুনন্দার হাত ধরে টান দিয়ে হাসতে হাসতে বলেন, ওহে মহারানী, দেখলে, কেমন ঘটকালি করলাম?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই উনি আবার বলেন, আমার প্রাপ্যটার কথা ভুলে যেও না।

সুব্রতবাবু বলেন, বৌমা, আমার মা জননীকেই তো তোমরা পাচ্ছো। আর কি প্রাপ্য চাও?

শিবানী চাপা হাসি হেসে বলেন, দাদা, আপনি আমাকে পথে বসিয়ে দিলেন। ভেবেছিলাম, শিল্পীর মা-বাবার ঘাড় ভেঙে অন্তত দশ ভরির একটা ভাল হার...

সবাই হাসেন।

সুব্রতবাবু গলা চড়িয়ে বলেন, মা জননী, কোথায় গেলে?

খুব ধীর স্থির পদক্ষেপ দুর্বা শিবানীর শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওনার সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখ নীচু করে বলে, আপনি কিছু বলবেন?

মা জননী, ছেলের কথায় রাগ করোনি তো?

দু'এক মিনিট দুর্বা কোনকথা বলতে পারে না। মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ ওনার দিকে তাকিয়েই চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলে, কোন মা কি ছেলের কথায় রাগ করতে পারে?

ওর চোখের জল দেখে সবার চোখই ভিজে ওঠে কিন্তু কারুর মুখ দিয়ে একটি শব্দও বেরোয় না। সবাই যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য বোবা হয়ে যান।

দুর্বা আবার ওনার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আমি আপনাকে কি বলে

ডাকব?

সুব্রতবাবু দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা ধরে বলেন, মা জননী, তুমি শুধু তোমার বাবাকেই বাবা বলবে আমাকে তুমি ছেলে বলে ডাকবে।

ছেলে!

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে দুর্বা ওনার বুকের উপর মুখখানা রেখেই আনন্দে খুশিতে গর্বে চোখের জল ফেলে।

দুর্বার ছেলেও মা জননীর চোখের জল দেখে নিজেকে সংযত রাখতে পারেন না।

সারদা পাশেই দাঁড়িয়েছিল কিন্তু তবুও শিবানী চিৎকার করে ওঠেন, শিল্পী আর ওর ছেলে ছাড়াও আমাদের সবাইকে কফি দাও।

সারদা একটু পরেই সবাইকে কফি দিয়েই বলে, বাবাই সোনা কোথায় গেল?

শিবানী বলেন, ও যেখানেই থাক, ওকে ধরে আনো এখানে।

হ্যাঁ, সারদা তাতাইয়ের ঘর থেকে ওকে টেনে আনে।

শিবানী বলেন, আয় বাবা, আমার কাছে আয়।

সবার মনেই কত কথা, কত গুঞ্জন কিন্তু কারুর মুখ দিয়েই কোন কথা বেরোয় না।

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়েই দুর্বা সুব্রতবাবুর এক হাত দু'হাতের মধ্যে নিয়েই বলে, ছেলে, তুমি গান শুনতে চেয়েছিলে, তাই শুরু করছি—

কেন তোমরা আমায় ডাকো
পাই নে সময় গানে গানে।
পথ আমারে শুধায় লোকে
পথ কি আমার পড়ে চোখে,
চলি যে কোন দিকের পানে
গানে গানে।
দাও না ছুটি, ধর ত্রুটি,
নিই নে কানে।
মন ভেসে যায় গানে গানে।
আজ যে কুসুম-ফোটার বেলা,
আকাশে আজ রঙের মেলা,
সকল দিকেই আমায় টানে
গানে গানে।
কেন তোমরা আমায় ডাকো,
আমার মন না মানে।

গান শেষ হতেই ভারতী দুর্বাকে কাছে টেনে নিয়ে এক গালে চুমু খেয়ে

বলেন, সত্যি, তোমার গান শুনে মন যে কোথায় চলে যায়...

শিবানী বলেন, শিল্পী, তোমার কাছে এইসব গান শুনে আর মনে হয় না, আমরা এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর বাসিন্দা।

হঠাৎ সারদা বেশ গলা চড়িয়ে বলে, ও বড়মা, দারুণ মেঘ করেছে। মনে হচ্ছে এখুনি ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামবে।

ভারতী যেন বকুনি দিয়ে বলেন, বর্ষাকালে বৃষ্টি হবে, তা অত বলার কি আছে? সুনন্দারা তো গাড়ি নিয়েই এসেছে। অত চিন্তার কি আছে?

শিবানী হাসতে হাসতে বলেন, আর যদি তেমন বৃষ্টি হয় যে গাড়িও চালানো যাবে না, তাহলে ওরা আজ এখানেই থাকবে। ওরা তো জলে পড়েনি।

সুব্রতবাবু বলেন, ঠিক বলেছ বৌমা।

ওনার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়া।

এক মুহূর্ত দেরি না করে দুর্বা গলা ছেড়ে গেয়ে ওঠে—

পাগলা হাওয়ার বাদল-দিনে
পাগল আমার মন জেগে ওঠে।
চেনাশোনার কোন বাইরে
যেখানে পথ নাই নাই রে
যেখানে অকারণে যায় ছুটে।
পাগলা হাওয়ার বাদল-দিনে
পাগল আমার মন জেগে ওঠে।...

দুর্বা গান থামিয়েই হেসে ওঠে।

মা জননী, থামলে কেন? গানটা শেষ করো।

ছেলে পুরো গানটা শোনাতে হবে?

নিশ্চয়ই।

দুর্বা হাসতে হাসতেই আবার শুরু করে

ঘরের মুখে আর কি রে
কোনো দিন সে যাবে ফিরে।
যাবে না, যাবে না—
দেয়াল যত সব গেল টুটে।
বৃষ্টি-নেশা-ভরা সন্ধ্যাবেলা
কোন্ বলরামের আমি চেলা,
আমার স্বপ্ন ঘিরে
নাচে মাতাল জুটে।
যত মাতাল জুটে।

যা না চাইবার
তাই আজি চাই গো,
যা নাপাইবার
তাই কোথা পাই গো।
পাব না, পাব না,
মরি অসম্ভবের পায়ে
মাথা কুটে।
পাগলা হাওয়ার বাদল-দিনে
পাগল আমার মন জেগে ওঠে।

গান শেষ হতেই দুর্বা দু'হাত দিয়ে সুব্রতবাবুর মুখখানা ধরে গালে চুমু খেয়ে বলে, ছেলে, আজ আসি। মা-র কাছে আসতে ভুলে যেও না।

তারপর ওনাকে প্রণাম করেই দুর্বা প্রণাম করে ভারতী-শিবানীকে।

সঙ্গে সঙ্গে ভারতী বলেন, দেখছিস শিবানী, তোর শিল্পী কি এক চোখা? ওনাকে আদর করলো আর আমরা কি গঙ্গার জলে ভেসে এসেছি?

তোমাদের দুটো করে ছেলে আর আমার একটা ছেলে। আমি তো ওকে বেশি আদর করবই।

দুর্বা হাসতে হাসতেই বলে, সারদা মাসী, গুড নাইট। এর পর যেদিন আসব, সেদিনও আজকের মতো ইলিশ মাছ খাওয়াবে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাওয়াবো।

সুনন্দাও সবার কাছ থেকে বিদায় নেন। ওরা দু'জনেই যাবার জন্য পা বাড়াতেই হঠাৎ দুর্বা পিছন ফিরে কোনমতে হাসি চেপে সবাইয়ের দিকে চেয়ে বলে, এই যে দুই মায়ের আদরের বাবাই সোনা, গুড নাইট! সী ইউ এগেন।

দুর্বা প্রায় লাফ দিয়ে গাড়িতে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি স্টার্ট দেয়। আস্তে আস্তে চলতে শুরু করে। দু'এক মিনিটের মধ্যেই দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

সুব্রতবাবু বললেন, সী কেম, সী স', সী কংকার্ড!

হ্যাঁ, দাদা, ও ঠিক কাল বৈশাখীর ঝড়ের মতো আমাদের সবাইকে উড়িয়ে নিয়ে গেল।

চার

সেদিন কমনরুমে বসে নানা কথাবার্তার মধ্যেই হঠাৎ নমিতা ঘোষাল একটু কৌতুক মেশানো হাসি হেসে বলেন, আচ্ছা ভারতী, তোর বরের নাম সুব্রত, তাই না?

হ্যাঁ।

ছেলের নাম দেবব্রত?

হ্যাঁ।

তোর দেওরের নাম কি ছিল?

তপোব্রত।

ওর ছেলের নাম?

শুভব্রত।

নমিতা একটু হেসে বলেন, বাঃ! বেশ মিলতো সবার নামে! সবার নামের শেষেই ব্রত!

একটু পরেই উনি প্রশ্ন করেন, ছেলেদের নাম কে রেখেছে?

ওদের দু'জনের নামই ঠাকুরপোর দেওয়া।

উনি ভুরু কুঁচকে বলেন, তোদের কাছেই শুনেছি, শিবানীর ছেলে হবার আগেই তোর দেওর মারা যায়।

হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছিস।

তাহলে সে ছেলের নাম রাখলো কী করে?

ভারতী একটু হেসে বলেন, শিবানী প্রেগন্যান্ট হবার পরই ঠাকুরপো বলেছিল, ছেলে হলে নাম হবে...

আই সী।

নমিতা আবার চুপ করেন কিন্তু দু'তিন মিনিট পরই প্রশ্ন করেন, তোরা তো সরকার।

হ্যাঁ।

কিন্তু শিবানী কি বিয়ের আগে ব্যানার্জী ছিল বলে এখনও...

ভারতী হাসতে হাসতে বলেন, না, না, শিবানী মুখার্জী পরিবারের মেয়ে।

তবে তুই সরকার আর তোর ঠাকুরমা ব্যানার্জী হলো কেমন করে?

ভারতী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, আমার স্বামী আর ঠাকুরপো এক মায়ের ছেলে না হলেও ওরা আপন ভাইয়ের চাইতে শত গুণ বেশি আপন ছিল।

উনি একটু হেসে বলেন, আর ঠাকুরপো ছিল আমার আদরের স্নেহের ছোট ভাই, হি ওয়াজ মাই ডিয়ারেস্ট অ্যান্ড ক্লোজেস্ট ফ্রেন্ড। তুই বিশ্বাস কর নমিতা, অমন ভাই বন্ধু পাওয়া সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার।

বুঝেছি।

এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর পর্ণা মুখার্জী একটু হেসে ভারতীকে বলেন, তোমাকে আর শিবানীদিকে দেখেশুনে মনে হয়, তোমরা যেন যমজ বোন!

তার চাইতেও বেশি।

হ্যাঁ, সত্যিই বেশি।

হ্যাঁ, সত্যিই তাই মনে হয়।

একটু থেমেই পর্ণা আবার বলেন, আমাদের ইকনমিক্স ডিপার্টমেন্টের লেখা তো তোমাদের সল্টলেকেই থাকে।

হ্যাঁ, ও তো মাঝে মাঝেই আমাদের বাড়ি আসে।

হ্যাঁ, লেখা বলেছে।

পর্ণা না থেমেই বলেন, লেখার কাছে শুনেছি, তোমার স্বামী বুঝি শিবানীদিকে অত্যন্ত স্নেহ করেন।

ভারতী চোখ দুটো বড় বড় করে সারা মুখে খুশির হাসি ছড়িয়ে বলেন, পর্ণা, তুমি ভাবতে পারবে না, ওদের দু'জনের সম্পর্ক। শিবানী ওর দাদাকে ঠিক নিজের বাবার মতই শ্রদ্ধা করে আর আমার স্বামী ওকে নিজের মেয়ের মতই স্নেহ করে।

পর্ণা একটু হেসে বলেন, হ্যাঁ, লেখাও একই কথা বলছিল।

দাদার কথা শিবানীর কাছে বেদবাক্য আর শিবানী যদি ওনাকে কিছু করতে বলে বা কোন ব্যাপারে কোন মতামত দেয়, তাহলে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর বারণ করলেও উনি বৌমার কথাই মেনে নেবেন।

নমিতা আর পর্ণা দু'জনেই প্রায় এক সঙ্গে বলেন, সত্যি, আজকাল এইরকম সম্পর্কের কথা ভাবাই যায় না।

মনোরমা তিন জনকেই চা দেয়।

চা খেতে খেতেই নমিতা প্রশ্ন করেন, হ্যাঁরে ভারতী, তোর ছেলে তো আই-আই-টি থেকে পাশ করেছে তাই না?

হ্যাঁ।

তার মানে বি. টেক?

না ; ও মাস্টার্স করে এম. টেক. হয়েছে।

সে তো দারুণ ব্যাপার!

পর্ণা সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, দারুণ বলে দারুণ ব্যাপার। আই-আই-টি'তে ভর্তি হওয়াই লটারীর ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়ার চাইতে কঠিন ; তার উপর এম. টেক।

ও একবার খুব জোরে নিঃশ্বাস ফেলে হাসতে হাসতে বলেন, আই-আই-টি'র এম. টেক. তো পৃথিবীর যে দেশে যাবে, সেখানেই ভাল চাকরি পাবে।

নমিতা বলেন, হ্যাঁ, পর্ণা, ঠিকই বলেছ। আমার এক ভাসুরপো খড়গপুর আই-আই-টি' থেকে এম. টেক. করে এখন আমেরিকায় খুব ভাল চাকরি করছে।

উনি মুহূর্তে জন্য থেমেই বলেন, অচ্ছা শিবানীর ছেলে তো ডাক্তারী পড়ছিল; ও কি পাশ করেছে?

ভারতী বলেন, ও এখন এম. এস. করছে। আর মাস ছয়েকের মধ্যেই পাশ করে বেরুবে।

ও কি কলকাতাতেই পড়ছে?

না, দিল্লীতে।

নমিতা না থেমেই বলেন, তার মানে অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল ইনিস্টিটিউটে?

হ্যাঁ।

শুনেছি, ওখানে চান্স পাওয়া খুবই কঠিন।

হ্যাঁ ঠিকই শুনেছিস।

ভারতী একটু হেসে বলেন, ওখানে এম. বি. বি. এস-এ মাত্র পঞ্চাশটা সীট। ভর্তি হবার জন্য সারা দেশ ছাড়াও বাংলাদেশ নেপাল, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, মালোশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও আরো কয়েটা দেশ থেকে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ভর্তি হবার জন্য পরীক্ষা দেয়।

বাপরে বাপ!

শিবানীর ছেলে তাতাই শুধু ওখান থেকে ভালভাবে এম. বি. বি. এস. পাশ করেনি ; সার্জারিতে হাইয়েস্ট নম্বর পেয়ে প্রেসিডেন্টস্ গোল্ড মেডেল পেয়েছে।

বলিস কিরে?

তোরা দেখিস, ও ওখান থেকে এম. এস. পাশ করার পর ঠিক ঠাকুরপোর মতই বিখ্যাত সার্জেন হবে।

যে ছেলে পেটে থাকতে শিবানী বিধবা হয়েছিল, সেই ছেলে ওর বাবার মতই সার্জেন হতে চলেছে শুনেও ভাল লাগছে।

পর্ণা বলেন, শিবানীদি পসথুমাস ছেলের মা হয়েও এবার একটু হাসতে পারবে।

ঘণ্টা পড়তে এখনও কয়েক মিনিট দেরি আছে দেখেই নমিতা বলেন, হ্যাঁরে ভারতী, ছেলে শিবানীকে চিঠি লিখে?

ভারতী সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ খুলেই একটু হেসে বলেন, দাঁড়া, তাতাই সোনার চিঠি দেখাচ্ছি।

ও তোকেও চিঠি দেয়?

ও একবার আমাকে লেখে একবার শিবানীকে...। হ্যাঁ হ্যাঁ, পেয়েছি।

চিঠিটা বের করেই নমিতার হাতে দিয়ে বলেন, নে, পড়ে দেখ।

চিঠি পড়েই উনি হো হো করে হেসে ওঠেন।

পর্ণা বলেন, নমিতাদি, হাসছেন কেন?

পড়ে দ্যাখ।

পর্ণা চিঠিটা হাতে নিয়েই জোর করে পড়তে শুরু করেন—আমার গত জন্মের এই জন্মের, আগামী পাঁচ শ' এক জন্মের বড়মা, আজ গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া গেজেট বেরিয়েছে, তুমি তোমার ৭১২ কোটি ৯১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬১৩ টাকা আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করেছ। ব্যস! কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ইন্টারনেটে

সে খবর ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে। তার ঠিক কয়েক মিনিট পরই বিল ক্লিনটন আমাকে ফোন করে বলে, হাই শুভ, তুমি তো জানো, দু'চারটে ছুকরীর সঙ্গে ফস্টি-নস্টি করে বেশ কয়েকটা মামলায় ফেসে গিয়েছি। তুমি কি আমাকে চার-পাঁচ মিলিয়ন ডলার দু'বছরের জন্য ধার দিতে পারো?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, বিল, হ্যাঁ, ফাইভ মিলিয়নই পাঠাচ্ছি। পনের মিনিট পরই সিটি ব্যাঙ্কে গেলে হিলারী বৌদি টাকাটা পেয়ে যাবে। এই টাকা কখনই তোমাকে ফেরত দিতে হবে না। হাজার হোক তুমি আমার বন্ধু আর হিলারী বৌদি কলকাতার বেথুন কলেজে বড়মা-র কাছে পড়েছে।

বলো বড়মা, তোমার ছেলে হিসেবে ঠিক কাজ করিনি?

তিন কোটি ছাপান্ন হাজার প্রণাম।

—তোমার তাতাই সোনা

পর্ণা চিঠি পড়া শেষ হতেই হো হো করে হেসে ওঠেন।

নমিতা হাসতে হাসতে বলেন, সত্যি ভারতী, ছেলেটা তো দারুণ ইন্টারেস্টিং।

ভারতীও হাসতে হাসতে বলেন, তাতাই সোনা মাঝে মাঝেই এইরকম চিঠি লেখে। ওর এর আগের চিঠিটাও খুব মজার ছিল।

কি লিখছিল?

দাঁড়া, হাতড়ে চিঠিটা বের করতেই পর্ণা বলে, আমাকে দিন ; আমি পড়ছি।...বড়মা, বড়মা,—ভীষণ ব্যস্ত। এখুনি অপারেশন থিয়েটারে ঢুকতে হবে। শুধু হেডলাইন গুলো লিখেছি—দিল্লী ইউনিভার্সিটি, মিরান্ডা আর লেডি শ্রীরাম কলেজের ৬০৪ জন পরমা সুন্দরী ছাত্রী, ৩৭ জন যুবতী অধ্যাপিকা আর সর্বসাকুল্যে ১২৭ টি M.B.B.S. আর M.D/ M.S. পাশ করা ধনীর দুলালী আমাকে বিয়ে করার জন্য বিখ্যাত রামলীলা ময়দানে প্রজাপতি যজ্ঞ শুরু করেছে। কিন্তু আমি সাফ জানিয়ে দিয়েছি আমাকে বিয়ে করতে না পারলে মাধুরী দীক্ষিত আত্মহত্যা করবে। তাছাড়া আমি বলেছি, ওকে বিয়ে করব।

বলো বড়মা, তোমার ছেলে হয়ে আমি কি মাধুরীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি?

ওয়ান মিলিয়ান অ্যান্ড ওয়ান প্রণাম।

—তোমার তাতাই সোনা

কখন যে ঘণ্টা পড়েছে আর কখন যে শিবানী ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তা কেউ টেরও পাননি।

শিবানী সঙ্গে সঙ্গে বলেন, ভারতী, তুই তাতাইয়ের চিঠি ওদের দেখালি কী করে?

নমিতা বলেন, শিবানী, তোর ছেলে তো দারুণ ইন্টারেস্টিং!

পর্ণা বলেন, সত্যি ভারী মজার চিঠি লেখে তোমার ছেলে। ওর চিঠি পড়ে

তো আমরা হাসতে হাসতে...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই শিবানী ব্যাগ থেকে একটা পোস্টকার্ড বের করে বলেন, কলেজে যাবার জন্য বেরুচ্ছি, ঠিক তখনই ওর এই পোস্ট কার্ড পেলাম।

পর্ণা বলেন, দেখি, দেখি, কি লিখেছে।

দ্যাখ।

শিবানী পোস্টকার্ড ওর হাতে দিয়েই বলেন, এটা কোন চিঠি লেখার ছিরি।

সে কথায় কান না দিয়ে পর্ণা জোরে জোরে পড়ে–

আমার গ্রেট বড়মা, তুমি আমাকে বড্ড ভালবাসো।

–তোমার তাতাই সোনা

মা মাগো, তুমি আদর দিয়ে দিয়ে আমার মাথাটা খেয়েছ।

–তোমার তাতাই সোনা

পর্ণা আর নমিতা হো হো করে হেসে ওঠেন।

শিবানী বলেন, তোমরাই বলো, হাজার মাইল দূর থেকে ছেলে এইরকম চিঠি লিখলে কোন মায়ের ভাল লাগে?

ভারতী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েই বলেন, শিবানী, এখন চল তো বাড়ি যাই। তোর জন্য অনেকক্ষণ বসে আছি।

হ্যাঁ, চল।

দিল্লী আর হায়দ্রাবাদ ঘুরে ছ'দিন পর কলকাতা ফিরলেও বাড়িতে গেলেন না। মিঃ চৌধুরী এয়ার পোর্ট থেকে তারাতলায় ফ্যাক্টারী ঘুরে বাড়ি ফিরলেন প্রায় আটটা নাগাদ।

দুর্বা বলে, বাবা, তুমি খুব টায়ার্ড, তাই না?

খুব না হলেও একটু ক্লান্ত লাগছে।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, হায়দ্রাবাদের ফ্যাক্টারীর এক্সপ্যানসান হবে কিন্তু কতকগুলো সমস্যার জন্য সব আটকে ছিল। তাই সকাল থেকে টানা চার ঘণ্টা মিটিং করেছি অন্ধ্র গভর্নমেন্টের ইন্ড্রাষ্ট্রী সেক্রেটারি আর স্টেট ব্যাঙ্ক অব হায়দ্রাবাদের এক ডিরেক্টরের সঙ্গে।

সুনন্দা প্রশ্ন করেন, তারপর কি খেয়েদেয়ে রেষ্ট নিতে পেরেছিলে?

রেষ্ট নেব কী করে? ফ্যাক্টারীতে কি কম কাজ ছিল?

মিঃ চৌধুরী আরো বলেন, ফ্লাইটটা যে ধরতে পেরেছি, সেটাই আমার ভাগ্য।

সুনন্দা বলেন, চা শেষ করেই বাথরুমে যাও। ভালভাবে চান করলে ক্লান্তিভাব অনেক কমে যাবে।

হ্যাঁ, যাচ্ছি।

চান-টান করার পর মিঃ চৌধুরী ড্রইংরুমে বসেই সুনন্দার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলেন, রাত্রে কি খাওয়াবে?

সুনন্দা জবাব দেবার আগেই দুর্বা বলে, রাত্রে তুমি তোমার প্রিয় খাবারই খেতে পাবে।

প্রিয় মানে?

সুনন্দা বলেন, রাত্রে ফ্রয়েড রাইস আর খুব বড় বড় চিংড়ির মালাইকারী... লাভলি!

এবার উনি চাপা হাসি হেসে বলেন, রাত্রে তোমাকে শুধু লাভলি খাবারই খাওয়াবো না, একটা দারুণ ভাল খবরও শোনাবো।

কী দারুণ ভাল খবর?

আগে খেয়ে দেয়ে নাও, তারপর বলব।

না, না, এখুনি বলো, কি দারুণ ভাল খবর।

এখনি বলতে হবে?

হ্যাঁ, এখনি বলতে হবে।

ঠিক আছে ; তাহলে শোনো।

দুর্বা সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে চলে যায়।

সুনন্দার কাছে সবিস্তারে সবকিছু শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ চৌধুরী আনন্দে খুশিতে চিৎকার করেন, হোয়াট এ গ্রেট নিউজ! বিলিভ মী সুনন্দা, আমি জানতাম, ভাল ছেলের সঙ্গেই ময়নার বিয়ে হবে কিন্তু স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, এত ভাল পাত্র এত সহজে পাওয়া যাবে।

উনি সঙ্গে সঙ্গে গলা চড়িয়ে হাঁক দেন, ময়না, কাম হিয়ার।

দুর্বা ধীর পদক্ষেপে ওনার কাছে গিয়েই বলে, বাবা, ডাকছো কেন?

মিঃ চৌধুরী দু'হাত দিয়ে মেয়ের মুখখানা ধরে চোখ দুটো বড় বড় করে বলেন, মা, এত ভাল ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে ঠিক হয়েছে শুনে খুব ভাল লাগছে।

উনি এক নিঃশ্বাসেই বলেন, ছেলেটাকে তোর সত্যি পছন্দ হয়েছে তো?

দুর্বা বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে বলে, হ্যাঁ, বাবা, ঐ ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে বলে আমি খুশি কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশি খুশি ছেলেকে আর দু'জন মা পেয়ে।

ও মুখ তুলে মিঃ চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, বাবা, তুমি বিশ্বাস করো, এই তিনজনের কোন তুলনা হয় না।

ময়না, তোর কথা শুনে খুব ভাল লাগছে।

মিঃ চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গেই সুনন্দার দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমরা মাঝে মধ্যে ওদের টেলিফোন করো তো?

ওনার কথা শুনে সুনন্দা হাসতে হাসতে বলেন, করি মানে? সারাদিন কতবার টেলিফোন আসছে আর কতবার আমরা করছি, তার কি ঠিক-ঠিকানা আছে!

তাই নাকি?

তবে কী?

সুনন্দা না থেমেই বলেন, দাদা, ভারতীদি আর শিবানীদি এখন কত খুটিনাটি ব্যাপারেও যে ময়নার পরামর্শ নেন, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

মিঃ চৌধুরী হো হো করে হেসে উঠেই প্রশ্ন করেন, খুটিনাটি ব্যাপারে মানে?

দুর্বা একটু হেসে বলে, পরশু দিনের কথা তোমাকে বলি।

পরশু কি হয়েছিল?

অফিসে পৌঁছবার একটু পরই ছেলে আমাকে ফোন করলো—

মা জননী, তুমি এখন বাড়ি আছো তো?

হ্যাঁ, আছি।

তুমি কোথাও বেরুবে কি?

না, না, আমি কোথাও বেরুব না।

ভালই হলো।

ছেলে, তুমি কি আসবে?

না, মা জননী, আমি আসব না। আমি কিছু টাকা দিয়ে আমার ড্রাইভারকে তোমার কাছে পাঠিয়েছি। তোমাকে আমার একটা কাজ করতে হবে।

তুমি বলো, কি করতে হবে।

আমার যে টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট তিনিও একজন ভাল এঞ্জিনিয়ার। অফিসে এসে মনে পড়লো, আজ তার মেয়ের বিয়ে।

মেয়েটির জন্য প্রেজেনটেশান কিনতে হবে?

হ্যাঁ, মা জননী।

তুমি কি জানো, মেয়েটি কি করে বা কতদূর লেখাপড়া...

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মেয়েটি ডাক্তারী পাশ করেছে গত বছরেই। বিয়ে করছে ওরই এক সহপাঠী বন্ধুকে।

ছেলে, তাহলে তো মেয়েটিকে একটা ভাল শাড়িই দিতে হবে।

হ্যাঁ, মা জননী, তা তো দিতেই হবে।

ঠিক আছে, ড্রাইভার এলেই আমি দোকান গিয়ে শাড়ি কিনে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মা জননী, তোমার একটু কষ্ট হবে কিন্তু...

কষ্ট আবার কি? ছেলে বিয়ে বাড়ি যাবে আর আমি একটা শড়ি কিনে দিতে পারবো না?

শুনে মিঃ চৌধুরী, একটু হাসেন।

সুনন্দা স্বামীকে বলেন, তুমি তো মাত্র একটা ঘটনা শুনলে। এখন ওদের সব ব্যাপারেই ময়নার সাহায্য, ময়নার পরামর্শ চাই।

এখন বলো, আমাকে কবে ওদের ওখানে নিয়ে যাবে।

মিঃ চৌধুরী না থেমেই বলেন, মনে হচ্ছে। এখনই ছুটে যাই ওদের কাছে।

ওনার কথায় মা আর মেয়ে হেসে ওঠে।

সুনন্দা বলেন, কালই আমি ওদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করবো, কবে তোমাকে নিয়ে ওখানে...

ইয়েস! ডোন্ট ডিলে!

ওরা গাড়ি থেকে নামতেই সুব্রতবাবু এক গাল হেসে অভ্যর্থনা করেন, আসুন, ভাই, আসুন।

উনি না থেমেই বলেন, এসো বৌমা, এসো মা জননী।

ভারতী আর শিবানী পাশেই ছিলেন।

শিবানী দুর্বার একটা হাত ধরে বলেন, শিল্পী, চলো ভিতরে যাই। ভারতী, তুই আমার দুই দাদা আর সুনন্দাকে নিয়ে আয়।

ভারতী বলেন, আমরা তোর পিছন পিছনই আসছি।

ওরা সবাই শিবানীর ড্রইংরুমে ঢুকতেই দুর্বা ওর বাবার একটা হাত ধরে একটু এগিয়ে যায়। সামনের মালা দেওয়া ছবিটা দেখিয়ে ও বলে, বাবা, এই হচ্ছে কাকুর ছবি।

মিঃ চৌধুরী অপলক দৃষ্টিতে দু'এক মিনিট ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বলেন, দুটো চোখ দেখলেই বোঝা যায়, উনি কত ব্রিলিয়ান্ট ছিলেন।

হ্যাঁ, বাবা, ঠিক বলেছ।

দুর্বা মুহূর্তের জন্য থেমেই বলে, কাকুর মুখের দিকে তাকালেই স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি শুধু সুন্দর ছিলেন না, অসাধারণও ছিলেন।

ময়না, যাঁরা অসাধারণ, তাঁদের চোখে-মুখে সৌন্দর্য ফুটে উঠবেই।

ঘরের অন্যান্যরা চুপ করে দাঁড়িয়ে।

দুর্বা আবার ওর বাবার হাত ধরে বলে, কাকুর ঘর দেখবে, এসো।

মিনিট দশেক পর দুর্বা ওর বাবাকে নিয়ে ড্রইংরুমে আসতেই সুব্রতবাবু হাসতে হাসতে মিঃ চৌধুরীকে বলেন, দেখছেন তো ভাই, আপনার মেয়ে আমাদের দুটো বাড়ির উপর কেমন একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করেছে?

মিঃ চৌধুরীও হাসতে হাসতে বলেন, ময়নার কাণ্ড দেখে তো তাই মনে হলো।

ঠিক সেই সময় সারদা সবার কফি নিয়ে হাজির। ওকে দেখেই দুর্বা বলে, সারদা মাসী, আমার ইলিশ হয়েছে তো?

তুমি আসছো আর ইলিশ হবে না, তাই কখনো হয়?

সুনন্দা সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলেন, দেখছ, তোমার মেয়ের কাণ্ড?

মিঃ চৌধুরী হাসতে হাসতে সুব্রতবাবুকে বলেন, দাদা, আমার মেয়ে কি আপনাদের সবাইকেই হাতের মুঠোয়...

ওনাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সুব্রতবাবু বলেন, ভাই, আমরা এখন পরাজিত সেনাপতি, উই আর প্রিজনার্স অব ওয়ার। আপনার মেয়ের কথা না শুনে তো উপায় নেই আমাদের।

মিঃ চৌধুরী একটু হেসে বলেন, ময়নাকে নিয়ে আপনারা বেশ নাটক জমিয়েছেন দেখছি।

ভারতী বলেন, নাটক বলে নাটক।

কফি খেতে খেতেই টুকটাক কথাবার্তা হয়। সুনন্দা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলেন, বাবাই তো অফিসের কাজে বোম্বে গিয়েছে তুমি ওর ছবি দেখবে?

হ্যাঁ, দেখাও।

শিবানী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি ওর ছবি আনছি।

উনি তাতাইয়ের ঘর থেকে বাবাইয়ের ছবি এনে মিঃ চৌধুরীর হাতে দিয়ে বলেন, দাদা, বাবাইসোনার ছবি দেখুন।

ছবিটা হাতে নিয়ে দু'এক মিনিট ভাল করে দেখেই একটু হেসে বলেন, খুবই সুন্দর দেখতে।

ভারতী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, দাঁড়ান, আমাদের ছোট ছেলের ছবি নিয়ে আসি।

তাতাইয়ের ছবি দেখতে দেখতেই মিঃ চৌধুরী একটু হেসে বলেন, একেও দেখতে খুব সুন্দর কিন্তু চোখ দুটো দেখলেই মনে হয় একটু দুষ্টু আছে।

দুর্বা সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হাসতে বলে, বাবা, তাতাই একটু দুষ্টু না, মহা দুষ্টু ছেলে! ওর কাণ্ড-কারখানা শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

কেন? ও কি করে?

সুব্রতবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলেন, একবার বিকেলবেলার দিকে ও আমাকে বলল, চলো, জ্যেঠু একটু ঘুরে আসি। বৌমাকে বলল, আমাকে নিয়ে একটু বেরুচ্ছে। তারপর কি করলো জানেন?

কী?

আমাকে নিয়ে সোজা পুরী।...

মিঃ চৌধুরী অবাক হয়ে বলেন, পুরী? মানে উড়িষ্যার...

হ্যাঁ, হ্যাঁ, উড়িষ্যার পুরী।

বাড়িতে কিছু না জানিয়েই ও আপনাকে পুরী নিয়ে গেল?

হাওড়া স্টেশন থেকে ওর বড়মাকে ফোন করে জানিয়েছিল, আমাকে নিয়ে

পুরী যাচ্ছে।

তারপর?

আমরা দু'জনেই এক জামা-প্যান্ট পরে বেরিয়েছি। তাছাড়া আমাকে পকেটে একটা পয়সাও নেই।

শুনে অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন সুব্রতবাবুর দিকে।

সুব্রতবাবু বলে যান, আমাকে নিয়ে সোজা বি. এন. আর. হোটেলে। তারপর চা খেয়েই বাজারে গিয়ে চার সেট করে পায়জামা-পাঞ্জাবি-আন্ডার ওয়ার ছাড়াও রুমাল, টুথব্রাশ-টুথ পেস্ট আর সেভিং সেট কেনা হলো।

কি আশ্চর্য!

বিশ্বাস করুন ভাই, কি আনন্দে আর শান্তিতে যে ওখানে একটা সপ্তাহ কাটিয়েছি, তা বলতে পারবো না।

উনি থামতেই ভারতী একটু হেসে বলেন, এইতো গতবার এসে দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়ার একটু আগেই তাতাই সোনা বলল, বড়মা, আমি জেঠুকে নিয়ে একটু ঘুরে আসছি।

ভারতী এইটুক বলতেই সুব্রত বাবু বলেন, আমাকে নিয়ে সোজা নিজামে ; ওখানে নান আর চাপ খাবার পর নিউ এম্পায়ারের ম্যাটিনী আর লাইট হাউসে ইভনিং শো'তে দুটো খুব ভাল ছবি দেখার পর পার্ক স্ট্রীটে ডিনার...

ফিরলেন কখন?

রাত সাড়ে এগারটায়।

মিঃ চোধুরী সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করেন, ও বললেই আপনি এইরকম বেড়িয়ে পড়েন?

হ্যাঁ, ভাই, ও যা বলে, আমি তাই করি।

সত্যি আশ্চর্যের ব্যাপার।

সুব্রতবাবু একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, আসল কথা কি জানেন ভাই, তাতাই সোনা আমার একটা খেলনা, আমার একটা স্বপ্ন। ওর কোন কথা আমি রাখব না, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

কিন্তু আচ্ছা খামখেয়ালী ছেলে।

কিন্তু ভাই, এই খামখেয়ালী ছেলেটাই এম. বি. বি. এস-এ সার্জারিতে রেকর্ড নম্বর পেয়ে প্রেসিডেন্টস্ গোল্ড মেডেল পেয়েছে।

মিঃ চৌধুরী প্রায় অবিশ্বাস্য সুরে বলেন, বলেন, কী? ও প্রেসিডেন্টস্ গোল্ড মেডেল পেয়েছে?

হ্যাঁ, ভাই, ও রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পেয়েছে।

মাই গড! রিয়েলী এ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট।

ভারতী সঙ্গে সঙ্গে বলেন, আমরা তো আশা করছি, তাতাই সেনা এম. এস.

পরীক্ষাতেও আবার প্রেসিডেন্টস্ গোল্ড মেডেল পাবে।

ওদের কথা শেষ হতেই দুর্বা বলে, কবে যে এই পাগলা ছেলেটার সঙ্গে দেখা হবে, আমি শুধু তাই ভাবি। ওকে একটু কাছে পাবার জন্য মন ছটফট করে।

ভারতী হাসতেই বলেন, দুর্বা, তোমার সব দুঃখ ও ঘুচিয়ে দেবে। ও যদি এক জামা-প্যান্টে জ্যেঠুকে নিয়ে পুরী যেতে পারে, তাহলে তোমাকে নিয়ে যে আমার এই ছেলেটা কি করবে, তা শুধু ভগবানই জানেন।

সুনন্দা বলেন, এই শিবানী, এর মধ্যে ছেলের চিঠি এসেছে?

শিবানী কিছু বলার আগেই ভারতী উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাতাই সোনার দুটো চিঠি এসেছে পর পর, আমি সে চিঠি আনছি।

এক মিনিটের মধ্যেই ভারতী দুটো খাম হাতে নিয়ে শিবানীর শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সুনন্দার পাশে বসেই একটু হেসে বলেন, তাতাই সোনার চিঠি পড়ছি।

হ্যাঁ, পড়ো।

প্রথম চিঠিতে লিখেছে—মা-বড়মা মা-বড়মা মা-বড়মা, তোমরা অবিলম্বে একটা বোয়িং এয়ারক্রাফট্ কিনে আমাকে পাঠাও। আমি রোজ আধ ঘণ্টার জন্য কলকাতা যাবো।

—তোমাদের তাতাই সোনা

সুনন্দা অবাক হয়ে বলেন, ব্যস! চিঠি শেষ?

হ্যাঁ, এই হলো প্রথম চিঠি। পরশু যে চিঠি এসেছে সেটা পড়ছি।...মা, মা, মা, এবার কলকাতায় গেলে তুমি দিনরাত আমার কোলে চড়ে ঘুরে বেড়াবে।

—তোমার তাতাই সোনা।

শুধু সুনন্দা না, সবাই হাসেন।

ভারতী বলেন, এবার আমাকে লেখা চিঠিটা পড়ছি।...বড়মা, বড়মা, বড়মা—এক মিনিটের মধ্যে অপারেশন থিয়েটারে যাচ্ছি।

—তোমার তাতাই সোনা।

এত ছোট চিঠি কেউ লেখে?

এত ছোট চিঠি লেখার প্রধান কারণ, সত্যি ও বড্ড ব্যস্ত থাকে। আমার মনে হয়, তাতাই সোনা বোধহয় তিন-চার ঘণ্টার বেশি ঘুমুবারও সময় পায় না।

দুর্বা বলে, বলো কি বড়মা? এত কম ঘুমুলে তো ওর শরীর খারাপ হয়ে যাবে।

এবার সুব্রতবাবু বলেন, মা জননী, ও পড়াশুনার ব্যাপারে যেমন সিরিয়াস, সেইরকমই সিনসিয়ার।

উনি একটু থেমেই বলেন, ভারত-বিখ্যাত সার্জেন প্রফেসর রাও হচ্ছেন ওখানকার ডীন অব দ্য ফ্যাকাল্টী অব সার্জারি।

মিঃ চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে বলেন, আমি জানি প্রফেসর রাও-এর কথা। সত্যি ওনার মতো সার্জেন বোধহয় আমাদের দেশে আর নেই।

সুব্রতবাবু একটু হেসে বলেন, প্রফেসর রাও-এর মানস পুত্র হচ্ছে তাতাই সোনা। পড়াশুনা, লাইব্রেরী, আউট ডোর বা সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের ডিউটি ছাড়াও প্রফেসর রাও ওকে দিয়ে প্রত্যেক দিন দু'তিনটে অপারেশন করাবেনই।

সুনন্দা চোখ দুটো বড় বড় করে বলেন, বাবা! ওকে তো তাহলে সত্যি অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়।

শিবানী একটু হেসে বলেন, তাতাই সোনা কলকাতায় এলেই ভারতী সব সময় ওকে একটু বেশি ঘুমুবার আর ভাল করে খাওয়া দাওয়ার কথা বললেই ও বলবে, ভাল করে খাওয়া-দাওয়া আর ঘুমুবার জন্য সারাজীবন পড়ে আছে।

মিঃ চৌধুরী বলেন, দিদি, ও ঠিকই বলেছে।

শিবানী আবার বলেন, তাতাই সোনা হচ্ছে বাবাই সোনার অন্ধ ভক্ত। ও ওর ভাইদাকে যেমন পড়াশুনা পরিশ্রম করতে দেখেছে, ও নিজেও ঠিক সেইরকম...

মিঃ চৌধুরী একটু হেসে বলেন, ও বুঝি দেবব্রতকে খুব ভালবাসে?

ভারতী হাসতে হাসতে বলেন, খুব ভালবাসে বললে কিছুই বলা হয় না। বাবাই সোনা ওর ফ্রেন্ড-ফিলজফার অ্যান্ড গাইড। বাবাই যা যা পছন্দ করে, ও ঠিক তাই পছন্দ করে।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, ভাইদার গলা জড়িয়ে না শুয়ে ও কোনদিন ঘুমুতেও পারতো না।

সুনন্দা একটু হেসে বলেন, তার মানে ওরা দুজনে একেবারে জগাই-মাধাই।

শিবানী একটু হেসে বলেন, তার চাইতেও বেশি।

হঠাৎ সারদা এসে বলে, আপনারা কি শুধুই গল্প করবেন? খাওয়া-দাওয়া করবেন না?

ভারতী আর শিবানী একই সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলো।

খেতে বসার আগে ডাইনিং টেবিলের সামনে এসেই সুনন্দা বলে, আচ্ছা তোমরা কি করেছ বলো তো? এত কিছু রান্না করার কোন মানে হয়?

শিবানী বলেন, আমাদের ভাই আজ প্রথম এলো আর তার জন্য একটু ভাল-মন্দ রান্না করা হবে না?

দুর্বা সঙ্গে সঙ্গে বলে, ও ছোট মা, সব রান্নাবান্নাই বাবার জন্য আমার জন্য কিছু হয়নি?

সুব্রতবাবু বলেন, মা জননী, আসলে, সবকিছুই হয়েছে তোমার জন্য ; তোমার

বাবা যেহেতু এসে পড়েছেন, তাই তাকেও একটু ভাগ দেওয়া হবে।

ছেলে, তুমি ঠিক বলেছ। আমি তো দেখছি, সবই আমার পছন্দ মতো হয়েছে।

যাইহোক খেতে বসেও নানা কথাবার্তা হয়।

মিঃ চৌধুরী সুব্রতবাবুর দিকে তাকিয়ে বলেন, জানেন দাদা, ময়না এম. এ. পড়তে শুরু করার পরও আমরা ওর বিয়ে নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা করিনি কিন্তু ও ফাইন্যাল ইয়ারে উঠতেই সুনন্দা মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

হ্যাঁ, বৌমা বলেছেন।

বিশাখাপত্তনমে একটি আই-এ-এস ছেলেকে আমার খুব পছন্দ হয়েছিল...

শিবানী ওনার কথার মাঝখানেই বলেন, আমাদের সবাইকে দুঃখ দিয়ে শিল্পী কি করে ঐসব ছেলেদের কাউকে বিয়ে করবে?

মিঃ চৌধুরী একটু হেসে বলেন, যাইহোক দিদি, এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে ময়না যে আপনাদের পুত্রবধূ হতে পারবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

সুব্রতবাবু একটু হেসে বলেন, ভুলে যাবেন না, ম্যারেজেস আর হেলড ইন দ্য হেভেন। এ একেবারেই বিধির বিধান!

দাদা, এখন আর তা অস্বীকার করতে পারব না।

উনি সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করেন, দাদা, বিয়ে কবে নাগাদ হবে, সে বিষয়ে কি কিছু চিন্তা করেছেন?

সুব্রতবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলেন, তাতাই সোনার ফাইনাল পরীক্ষা আগস্ট-সেপ্টেম্বরের যে কোন সময় হবে; তারপর শীতকালের দিকে মানে মাঘ-ফাল্গুনে...

হ্যাঁ, হ্যাঁ, শীতকালে বিয়ে হওয়াই ভাল।

বেশ আনন্দে কাটল সারাদিন। বিকেলবেলায় চা-টা খেয়ে বিদায় নেবার আগে মিঃ চৌধুরী সুব্রতবাবুর দুটি হাত ধরে বলেন, দাদা, আমি দিন দশেক কলকাতায় আছি। আপনি দুই দিদিকে নিয়ে দয়া করে সামনের রবিবার আমাদের ওখানে আসুন। আপনারা এলে আমরা খুব খুশি হব।

আরে ভাই, ওভাবে বলবেন না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা আসব।

পাঁচ

এই পৃথিবী আবহমান কাল থেকে ঘুরে চলেছে; এক মুহূর্তের ভগ্নাংশ সময়ের জন্যও এই বিচিত্র বিস্ময়কর পৃথিবীতে যে মানুষের বাস, তাদের অদৃষ্টের চাকাও নিত্য ঘুরে চলেছে সবকিছু তুচ্ছ করে। মানুষের শত অনুরোধ উপরোধ আকুতি-মিনতিতেও অদৃষ্টের চাকা এক পলের জন্য থমকে দাঁড়ায় না।

অদৃষ্ট যেমন নির্মম, তেমনই উদাসীন ও রহস্যময়। তার মনের কথা কেউ

জানতে পারে না।

সব মানুষই কত হিসেব-নিকেশ করে, কত স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যতের কিন্তু অদৃষ্টের নিছক খামখেয়ালীপনায় তা স্রোতের জলে খড়ের কুটোর মত ভেসে যায়। তাইতো অতীত দিনের জমিদারদের উত্তরপুরুষ কলকাতার রাজপথে হকার হয় আবার দীন-দরিদ্রের সন্তান খ্যাতি-যশ-অর্থ-প্রতিপত্তির স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়ায়। শত সহস্র কোটি টাকার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী অর্থের লোভ ও পরমা সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর মোহ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়; আবার কামিনী ও কাঞ্চনের মোহে কত অজস্র মানুষ সর্বস্ব খুইয়ে সারাজীবন হাহাকার করে।

কেউ জানে না কেন একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে গর্ভধারিনীকে সারাজীবন চোখের জল ফেলতে হয় ও বহু সন্তানের জননীকে সন্তানদের মুখে দু'মুঠো অন্ন জোগাবার জন্য দরজায় দরজায় ভিক্ষা করতে হয়।

সব মানুষের জীবনেই কিছু না কিছু অঘটন ঘটবেই। সুখী পরিবারেও কোন না কোন সময় ছন্দপতন ঘটবেই। জীবন-পথের সব যাত্রীকেই হোঁচট খেতে হবেই।

মাস খানেক পরের কথা।

রাত তখন প্রায় দশটা। একটু আগেই খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়েছে। সুব্রতবাবু শুতে যাবার উদ্যোগ-আয়োজন করছেন। ঠিক সেই সময় টেলিফোন।

হ্যালো দাদা, আমি আপনার মা জননীর বাবা বলছি।

হ্যাঁ, ভাই, বলুন কি ব্যাপার।

দাদা, হঠাৎ একটা গুরুতর সমস্যায় পড়েছি।

সুব্রতবাবু অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে বলেন, হঠাৎ কোন বিপদ ঘটলো নাকি?

না, তেমন কিছু না।

তবে?

আপনার ও দিদিদের সঙ্গে খুব জরুরী ব্যাপারে আলোচনা করতে চাই।

কি জরুরী ব্যাপার জানতে পারি কি?

দাদা, যখন দেখা হবে, তখন সব কথা বলব।

কবে দেখা করতে চান?

এখন তো রাত হয়েছে ; তা নয়তো আজই আলোচনা করতে পারলে ভাল হতো।

মিঃ চৌধুরী না থেমেই বলেন, দাদা, কাল কখন আসব বলুন।

কাল আমারও অফিস আছে, আপনার দুই দিদিরও কলেজ আছে।...

হ্যাঁ, তা তো আছে।

কাল আমি না হয় একটু তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরব আপনি সাড়ে ছ'টা-সাতটায় আসুন।

দাদা, আমি আর সুনন্দা সাড়ে ছ'টাতেই পৌঁছে যাবো।

ঠিক আছে, তাই আসবেন।

টেলিফোনে স্বামীর দু'একটা কথা শুনেই ভারতী বুঝেছেন, কোন গুরুতর ব্যাপার। তাই উনি সঙ্গে সঙ্গে শিবানীকে ডেকে পাঠান।

সুব্রতবাবু রিসিভার নামিয়েই দেখেন, ভারতী আর শিবানী পাশে দাঁড়িয়ে। বেশ চিন্তিত হয়েই উনি ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে বলেন, ঠিক বুঝতে পারছি না কি এমন গুরুতর সমস্যা হলো যে কালই...

ওনার কথা শেষ হবার আগেই ভারতী বলেন, কোন কারণে ওরা এই বিয়ে ক্যানসেল করতে চাইছেন বলে কি তোমার মনে হলো?

উনি তো কোনকিছুই খুলে বললেন না।

শিবানী বলেন, বাবাই সোনার মতো ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে ওদের কখনই কোন আপত্তি থাকতে পারে না। আমার মনে হয়, অন্য কোন সমস্যা নিয়ে ওরা কথা বলতে...

ভারতী বলেন, অন্য কি সমস্যা হতে পারে?

উনি না থেমেই বলেন, দুর্বা কোন ছেলেকে ভালবেসে বিয়ে করতে চায়নি, বাবাই কোন খারাপ কাজ করে, তেমন কথাও কেউ ওদের বলতে পারে না...

না, না, সেসব না।

তবে আবার কি সমস্যা? আমরা কি দু'-একশ ভরি সোনা বা লাখ লাখ টাকা নগদ চেয়েছি যে...

সুব্রতবাবু বলেন, এসব আলোচনা করে কোন লাভ নেই। দেখা যাক, কাল ওরা কি বলেন।

শুধু সে রাত না পরের দিন সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ওরা যে কি অস্বস্তিতে কাটান, তা ভাবা যায় না। কাজকর্মের ফাঁকে ওরা যখনই একটু সময় পেয়েছেন, তখনই কত ভাল-মন্দ কথা ওদের মনে আসে।

দুপুরের দিকে এক অফ পিরিয়ডে ভারতী শিবানীকে বলেন, হ্যাঁরে, আমি সুনন্দাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করব কি ব্যাপার?

না, কখনই না।

কেন বলতো?

যে কথা মিঃ চৌধুরী টেলিফোনে দাদাকে বললেন না, সেই কথা ও তোকে বলে দেবে?

তা ঠিক কিন্তু...

তাছাড়া আমাদেরও তো আত্মসম্মান আছে।

শিবানী না থেমেই বলেন, নেহাত আন্দাজ করে বা তর্কের খাতিরে বলছি,

যদি ওরা কোন কারণে বাবাই সোনার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে না চায়, তাহলে...

হ্যাঁ, বুঝেছি...

দ্যাখ ভারতী, ওদের মেয়ের সঙ্গে আমাদের ছেলের বিয়ে দেবার জন্য আমরা সীমা ছাড়িয়ে আগ্রহ দেখিয়েছি।...

তা ঠিক।

আমরা শুধু মেয়েটাকে ভালবাসিনি,ওর মা-বাবাকেও যথেষ্ট খাতির-যত্ন করেছি, ভালবেসেছি। এখন সুনন্দাকে ফোন করলে প্রায় হ্যাংলামির পর্যায়ে চলে যাবে।

ভারতী চুপ করে থাকেন।

শিবানী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, অধৈর্য হয়ে লাভ নেই। দেখাই যাক ওরা কি বলেন।

হ্যাঁ, তুই ঠিকই বলেছিস, সুনন্দাকে টেলিফোন করা ঠিক হবে না।

ওদের ক্লাশ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা ট্যাক্সিতে বাড়ি ফিরে যান। সাড়ে পাঁচটা বাজতে না বাজতেই সুব্রতবাবুও বাড়ি ফিরে আসেন।

সাড়ে ছ'টায় না, ঠিক পৌনে সাতটায় মিঃ চৌধুরী সস্ত্রীক এসে যান।

সুব্রতবাবু আর ভারতী ওদের অভ্যর্থনা করে শিবানীর বাড়ি নিয়ে যান। শিবানী প্রায় ছুটে এসে বলেন, পর পর দুটো টেলিফোন এল বলে সব ঘরে ধূপ দিতে দেরি হয়ে গেল।

সুনন্দা বলে, সব ঘরে ধূপ দেওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ, ভাই, হয়েছে।

সুব্রতবাবু বলেন, বৌমা আমার ভাইয়ের ছবিগুলোর সামনে প্রথমে ঘুম থেকে উঠে, তারপর স্নান করে, আবার সন্ধেতে আর রাত্তিরে শুতে যাবার আগে ধূপ দেন।

কেউ কোন কথা বলেন না।

শিবানী একটু হেসে বলেন, আর তো কিছু দেবার সেই তাই ধূপ দিই বার বার।

ভারতী ওর হাত ধরে বলেন, আয়, আমার পাশে...

হ্যাঁ, বসছি। সারদাকে...

ওনাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সুনন্দা বলেন, শিবানী, প্লীজ এখনই সারদাকে কফি করতে বলো না। আমরা চা-টা খেয়েই রওনা হয়েছি।

সুব্রতবাবু বলেন, ঠিক আছে বৌমা, একটু পরেই কফি করতে বলো।

উনি সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বলেন, হ্যাঁ, ভাই, বলুন, কি ব্যাপার।

মিঃ চৌধুরী শুরু করেন, দাদা, আমাদের ফরিদাবাদের ফ্যাক্টরীতে একটা নতুন ইউনিট খোলার ডিসিশন নেওয়া হয় কয়েকবছর আগেই। সব শুদ্ধ প্রায় সওয়া দু'শ কোটি টাকার প্রজেক্ট।

তার মানে কোয়াইট এ বিগ প্রজেক্ট।

হ্যাঁ, দাদা, বেশ বড় প্রজেক্ট।

উনি একটু থেমেই বলেন, গ্লোবাল টেন্ডার ডাকা হয় ; তারপর সুইডিস, জার্মান আর ব্রিটিশ ফার্মের অফার ইভ্যালুয়েট করার জন্য দু'জন চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে পাঠানো হয়...

হ্যাঁ, এসব তো করতেই হবে।

যাইহোক ব্রিটিশ ফার্মের অফারই শেষ পর্যন্ত অ্যাকসেপ্ট করা হয়েছে ; দাম ঠিক হয়েছে একশ বত্রিশ কোটি টাকা।

নাউ হোয়াট ইজ দ্যা প্রবেলম?

দাদা, ঐ মেসিনের ব্যাপারে আমাদের চারজন ইঞ্জিনিয়ারকে দু'বছর গ্লাসগোতে থাকতে হবে এবং ব্রিটিশ ফার্ম আর আমাদের ডিরেক্টররা ঠিক করেছেন, আমাকে ঐ টিমের লীডার হতে হবে।

এতো খুব ভাল খবর।

মিঃ চৌধুরী একটু হেসে বলেন, এই পর্যন্ত সত্যি ভাল খবর কিন্তু এর পর যা বলব, তা বোধ হয় ভাল লাগবে না।

ভারতী বলেন, কেন ভাই?

দিদি, দু'বছরের ব্যাপার বলে আমাদের সস্ত্রীকই যেতে হবে। ব্রিটিশ ফার্ম আমাদের ওখানকার সব খরচ-পত্তর দেবে আর আমাদের কোম্পানী শুধু আমাদের প্লেন ভাড়া দেবে।

শিবানী বলেন, সুনন্দা আপনার সঙ্গে গেলে সমস্যা কি?

বলছি, বলছি।

মিঃ চৌধুরী মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আমি কাল বিকেলেই লন্ডন থেকে ফ্যাক্স পেলাম কবে রওনা হতে হবে। বাংলা ক্যালেন্ডারের সঙ্গে সেই তারিখ মিলিয়ে দেখলাম, ২৯শে শ্রাবণ রাত্রে আমাদের রওনা হতে হবে।

ভারতী আর শিবানী দৃষ্টি বিনিময় করেন। সুব্রতবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, আই সী।

দাদা, আমি অফিস থেকেই আমাদের পুরোহিতের কাছে যাই। উনি বললেন, ২৩শে ও ২৫শে বিয়ের দিন আছে।

একটু ভেবেই সুব্রতবাবু বলেন, তার মানে অগাস্ট মাসের পাঁচ-সাত বা আট-ন' তারিখ হবে।

হ্যাঁ, দাদা, ঠিক বলেছেন।

সুব্রতবাবু খুব জোরে নিঃশ্বাস নিয়েই বলেন, তাতাই সোনার ফাইন্যাল পরীক্ষা শুরু হবে বোধহয় তার কয়েক দিনের মধ্যেই। সুতরাং সে সময় বিয়ে হলে ওর পক্ষে আসা কোনমতেই সম্ভব হবে না অথচ...

সুব্রতবাবু কথাটা শেষ করেন না, শেষ করতে পারেন না।

সুনন্দা বলে, দাদা, আমরাও খুব ভাল করে বুঝি যে তাতাই না থাকলে এই বিয়ের কথা আপনারা ভাবতে পারেন না।

হ্যাঁ, বৌমা, ঠিকই বলেছ।

আমাদের দু'জনের চাইতে ময়না আরো ভাল করে জানে, তাতাইয়ের অনুপস্থিতিতে ওদের বিয়ে হতে পারে না। তাইতো ও আমাকে বলছিল, তোমরা চলে যাও, আমি ছোট মা-র কাছে থাকব। ছোট মা আমার বিয়ে দিয়ে দেবেন।

সেই শুনে সুব্রতবাবু আর ভারতী-শিবানীও না হেসে পারেন না।

সুব্রতবাবু বলেন, না, বৌমা, তা হয় না। হাজার হোক মা জননী আপনাদের একমাত্র মেয়ে। আপনাদের অনুপস্থিতিতে কখনই ওর বিয়ে হতে পারে না।

মিঃ চৌধুরী ওনার দুটো হাত ধরে বলেন, দাদা, আপনি বলুন কি করা যায়। আমরা তো ভেবে কোন কুলকিনারা পাচ্ছি না।

ভাই, আমরাও খুব চিন্তায় পড়লাম। এক্ষুনি আপনাকে কিছু বলতে পারছি না। আমাদের কয়েক দিন সময় দিন। আমরা আলাপ আলোচনা করে দেখি, কি করা যায়।

কিন্তু দাদা, হাতে সময় খুব কম।

হাঁ, তাও জানি কিন্তু আমরা নিজেদের মধ্যে একটু কথা না বলে তো...

হ্যাঁ, দাদা, নিশ্চয়ই আপনারা আলোচনা করুন।

আপনি চিন্তা করবেন না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাকে আমাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেব।

কফি-টফি খেয়ে মিঃ চৌধুরী ও সুনন্দা বিদায় নেবার পরই সুব্রতবাবু শিবানীর দিকে তাকিয়ে বলেন, বলো তো বৌমা, কি অদ্ভুত সমস্যায় পড়লাম। তাতাই সোনাকে বাদ দিয়ে বাবাইয়ের বিয়ের কথা তো আমি ভাবতেই পারি না।

উনি না থেমেই বলেন, বাবাইয়ের বিয়ের সবকিছুই তো ও করবে, আমরা শুধু পিছনে থাকব।

শিবানী বলেন, ওরাও খুবই সমস্যায় পড়েছেন।

ভারতী বলেন, বাবাই এইসব শুনলে তো সোজা বলে দেবে, ভাইয়া ছাড়া এই বিয়ে হতে পারে না।

সুব্রতবাবু বলেন, তা তো বলবেই।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, বিয়ের খবর শুনলেই তাতাই সোনা আনন্দে খুশিতে পাগল হয়ে যাবে কিন্তু ফাইন্যাল পরীক্ষার ঠিক আগে আগেই ওকে

এই খবর জানালে ওর সত্যি খুব ক্ষতি হবে।

শিবানী বলেন, হ্যাঁ, দাদা, ওর মন তখন বিয়ের ব্যাপারেই নেচে উঠবে ও কিছুতেই পড়াশুনায় মন বসাতে পারবে না।

ভারতী বলেন, না, না, আমরা তাতাই সোনার এই ক্ষতি করতে পারি না।

ঠিক সেই সময় টেলিফোন।

রিসিভার হাতে না নিয়েই শিবানী বলেন, হ্যালো! ও শিল্পী তুমি!

হ্যাঁ, ছোট মা, আমি। মা-বাবা কি এখনও তোমাদের ওখানে আছেন?

না, মা ; ওরা মিনিট দশেক আগেই রওনা হয়েছেন।

মা কি বলেছে, বিয়ের ব্যাপারে আমি কি বলেছি?

শিবানী একটু হেসে বলেন, তুমি আমার কাছে থাকবে আর তাতাইয়ের পরীক্ষার পর...

হ্যাঁ, ছোট মা, আমি এই কথাই বলেছি।

সুব্রতবাব বলেন, মা জননী, তুমি মা-বাবার একমাত্র সন্তান। তাঁরা নিজে থেকে তোমার বিয়ে দেবেন না, তাই কি হতে পারে?

ছেলে, তুমি বলো, কেন হতে পারে না।

দুর্বা না থেমেই বলে যায়, আমি এত বছর মা-বাবার কাছে থাকলাম কিন্তু বাকি জীবন তো তোমাদের সবাইকে নিয়ে কাটাতে হবে। আমি তাতাইকে দুঃখ দিয়ে কি শান্তিতে সংসার করতে পারবো?

ও বোধ হয় কাঁদতে কাঁদতেই বলে, না, ছেলে, তোমাদের কাউকে দুঃখ দিয়ে বিয়ে করতে পারবো না।

ভারতী বলেন, ওরে পাগলী মেয়ে, তুমি যে আমাদের কাউকে দুঃখ দিতে পারবে না, তা আমরা খুব ভাল করেই জানি। প্লীজ তুমি কান্নাকাটি বা দুঃখ করো না। যাহোক একটা রাস্তা তো বের করতেই হবে।

আমার কিছু ভাল লাগছে না। তুমি ছোট মাকে বলো, আমাকে নিয়ে যেতে।

সুব্রতবাবু বলেন, মা জননী, শুধু তোমার ছোট মা না, আমরা সবাই তোমাকে নিয়ে আসব।

না, দুর্বা আর কোন কথা বলে না।

সুব্রতবাবু শিবানীকে বলেন, বৌমা, এই মেয়েটা আমাদের সবাইকে কি ভালবাসে, তা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি।

হ্যাঁ, দাদা, মেয়েটা সত্যি খুব ভাল।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ওরা এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। বাবাইও ছিল। ও খুব বেশি কথা বলেনি ; তবু বলেছিল, দুর্বা বোধহয় ঠিক কথাই বলেছিল

ওর মাকে। ও তোমাদের সঙ্গে মেলামেশা করে খুব ভাল করেই বুঝেছে, ভাইয়ার অনুপস্থিতিতে আমার বিয়ের কথা কেউ ভাবতেও পারে না।

বাবাই মুহূর্তের জন্য থেমে বলেছিল, যাইহোক তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে দেখো কি করবে আমি যাচ্ছি।

পরের দিন শুধু সুব্রতবাবু না, ভারতী আর শিবানীও অসুস্থতার অজুহাতে কামাই করে বাড়িতে রইলেন শুধু বিয়ের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিতে। ওরা আলোচনা করলেন সকাল-দুপুর-বিকেল-সন্ধে। শেষ পর্যন্ত তীব্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওরা রাত নটা নাগাদ সিদ্ধান্ত নিলেন, পঁচিশে শ্রাবণই বিয়ে হবে। তারপর তাতাইয়ের পরীক্ষা শেষ হবার পর ওকে শুধু সব কথা বলা হবে না, সব দোষ নিজেদের ঘাড়ে নেওয়া হবে।

সুব্রতবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, দরকার হলে আমি ওর কাছে ক্ষমা চাইব। যত রাগ-দুঃখ অভিমানই হোক ও তো আমাদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না। আমরাও ওকে ছাড়া বাঁচব না।

হ্যাঁ, পঁচিশে শ্রাবণই রাত্রি ৮টা ২৩ মি ৩২ সেকেন্ড গতে শ্রীমতী ভারতী ও শ্রী সুব্রত সরকারের একমাত্র পুত্র শ্রীমান দেবব্রতর সঙ্গে শ্রীমতী সুনন্দা ও শ্রীমানবেন্দ্র চৌধুরীর একমাত্র কন্যা কল্যাণীয়া দুর্বার শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হলো।

পরের দিন সন্ধের পর দেবব্রত তার নব পরিণীতা স্ত্রী দুর্বাকে নিয়ে এলো নিজেদের বাস ভবনে। কিছু আচার-অনুষ্ঠানের পর দুর্বা কালরাত্রি যাপনের জন্য গেল শিবানীর বাড়ি।

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে দুর্বা শিবানীকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

ছোট মা, কি করে যে বিয়ে হলো, তুমি ভাবতে পারবে না। মালাবদলের সময়েও আমাদের দু'জনের মুখে হাসি ছিল না। বাসর ঘরে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের ছেলে কান্নায় ভেঙে পড়লো। আমি একটি শব্দ উচ্চারণ না করে শুধু চোখের জল ফেললাম।

ও একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলে, ছোট মা, কি করে তাতাইয়ের কাছে মুখ দেখাবো? সে যদি আমাকে মেনে না নেয়, তাহলে আমি কি করে সংসার করবো?

মা, আজকের দিনে অমন করে চোখের জল ফেলতে সেই। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

একটু আগেই সুব্রতবাবু আর ভারতী এসে ওদের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

সুব্রতবাবু বলেন, মা জননী, তাতাই সোনার সব রাগ-দুঃখ-অভিমান আমি আমার বুকের মধ্যে টেনে নেব। আমাদের এই পাগলা ছেলে কখনই তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখবে না।

এত দুঃখ-কষ্ট-চোখের জল সত্ত্বেও সময় নির্মম উদাসীন বাউলের একতারা বাজিয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে যায়। বৌভাত ফুলশয্যাও হয় যথারীতি। চৌধুরী দম্পতিও লন্ডনের পথে দমদম থেকে দিল্লী রওনা হন। দু'চারদিন পর কর্মজীবন শুরু হয় সবারই। মাসী ঘুমুচ্ছে ; জেগে আছে শুধু দুর্বা।

না, ওর চোখে ঘুম নেই। কখনও চিত হয়ে শুয়ে কখনও উপুড় হয়ে ; কখনও কখনও শুয়ে থাকতে পারে না। ঝম ঝম করে বৃষ্টি শুরু হলেই জানলার ধারে দাঁড়ায়। আবার কখনও কখনও জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেয় বাইরে। বৃষ্টিতে হাত ভিজে যায়। আগে কত ভাল লাগতো বৃষ্টি দেখতে, বৃষ্টিতে ভিজতে। আর এখন? মনে হচ্ছে, প্রকৃতি যেন ওরই মতো বিষণ্ণ ; তাইতো চোখের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছেন ধরিত্রীকে।

আগে বৃষ্টি শুরু হলেই দুর্বা কত গান গাইতো কিন্তু বিয়ের দিন ঠিক হবার পর থেকেই ওর কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেছে। একটি গানও গাইতে পারে না। ইউনিভার্সিটির বন্ধুদের অনুরোধ-উপরোধ পীড়াপীড়িতেও বাসরে কিছুতেই একটা গানও গাইতে পারেনি। না, এখানে এসেও কাউকে গান শোনায়নি।

কিন্তু কি আশ্চর্য! আজ এই বর্ষণকান্ত ভাদ্রের অপরাহ্নে দুর্বা গুন গুন করে গেয়ে ওঠে—

না যদি বা এলে তুমি
এড়িয়ে যাবে তাই বলে?
অন্তরেতে নাই কি তুমি
সামনে আমার নাই বলে।...

অফিস থেকে ফিরে বাড়ির মধ্যে না ঢুকেই বাইরে দাঁড়িয়েই বাবাই চিৎকার করে, ও ছোট মা! ছোট মা!

শিবানী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বলেন, কিরে, অত চিৎকার করে ডাকছিস কেন?

ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের একটা টিকিট ডান হাতে উঁচু করে ধরে একটু হেসে বলে, আয়াম ফ্লাইং টু ডেলহি অন সানডে।

হঠাৎ দিল্লী যাবি কেন?

আমার ভাইয়ার ফাইন্যাল এম. এস. পরীক্ষা শুরু হচ্ছে সোমবার ; আমাকে সেদিন ওর কাছে থাকতে হবে না?

ওর চিৎকার শুনে ভারতী আর দুর্বাও বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। ভারতী বলেন, তোকে তাতাই সোনা ফোন করেছিল বুঝি?

তবে কি তোমাকে বা ছোটমাকে করবে?

বাবাই হাসতে হাসতে বলে, তোমরা যতই তাতাই সোনা তাতাই সোনা করো, ভাইয়া তোমাদের চাইতে আমাকে অনেক বেশি ভালবাসে।

শিবানী একটু হেসে বলেন, তার জন্য আমরা কি তোকে হিংসা করবো?

উনি না থেমেই বলেন, ও তোকে কখন ফোন করেছিল?

আর বলো না। ঠিক অফিস থেকে বেরুবার কয়েক মিনিট আগেই ফোন করেছিল। ওর ফোন পাবার সঙ্গে সঙ্গে অফিস ম্যানেজারকে বলে আমাদের ট্রাভেলিং এজেন্টকে দিয়ে রিটার্ন টিকিটের ব্যবস্থা করে...

ভারতী বলেন, ওর পরীক্ষা শেষ হবে কবে?

ভাইয়াও আমাকে বলেনি, আমিও কিছু জিজ্ঞেস করিনি। ফার্স্ট পরীক্ষা শুরুর খবর দিয়েই ও ফোন ছেড়ে দিল।

ও নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত ছিল।

হাঁ, তাই হবে।

শিবানী বলেন, এবার হাত-মুখ ধুয়ে চা-টা খা ; আমি আসছি।

হ্যাঁ, চা খেতে খেতেই বাবাই মা আর ছোটমাকে বলে, আমি সোমবার থাকব না বলে রবিবার আমাকে অফিসে যেতেই হবে। তোমরা যা নির্মল্য-পূজার প্রসাদ দেবে, তা ঠিক করে রেখো। আমি অফিস থেকে এয়ারপোর্ট যাবার পথে...

ভারতী বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা সব ঠিক করে রাখব।

চা-টা খেয়েই বাবাই ক্লান্তিতে একটু শুয়ে পড়ে। পাঁচ-দশ মিনিট পর দুর্বা ঘরে ঢুকতেই ও বলে, কাল তুমি একটা কাজ করবে?

বলো কি করতে হবে।

তুমি পার্ক স্ট্রীটের গিগিলস্ চেনো?

খুব চিনি। বন্ধুদের সঙ্গে ঐ দোকানে অনেকবার গিয়েছি।

খুব ভাল কথা।

বাবাই না থেমেই বলে, পার্কারের সব চাইতে ভাল দুটো কলম কিনতে হবে।

দুর্বা একটু হেসে বলে, তাতাইকে দেবে?

হ্যাঁ।

বাবাই একটু হেসে বলে, আমার দেওয়া নতুন কলম দিয়েই ভাইয়া হায়ার সেকেন্ডারী আর এম. বি. বি. এস ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে।

দুর্বা আবার একটু হেসে বলে, তোমার দেওয়া কলম তো দারুণ পয়া!

তা জানি না ; তবে দু'বারই আমার দেওয়া কলম দিয়ে পরীক্ষা দিয়ে অভাবনীয় ভাল ফল করেছে।

তাহলে তো এবারও ও আশা করবে, তুমি ওকে নতুন কলম দেবে?

ও আশা করবে না ভাইয়া জানে, এটা ওর প্রাপ্য।

ওর কথা শুনে দুর্বার খুব ভাল লাগে।

দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর বাবাই বলে, যদি পারো তুমি আরো দু'একটা দোকান দেখো।...

তুমি বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমি মনে মনে ঠিক করেছি আগে অক্সফোর্ড বুক শপ্-এ যাবো। ওখানে...

ভেরি গুড। ওখানেই তুমি সব চাইতে ভাল কলম পাবে।

তোমার আলমারী থেকেই টাকা নেব?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

দুর্বা একটু পরেই বলে, আমি এখান থেকেই একটা ট্যাক্সি নেব। দুই মা-কে কলেজে নামিয়ে দিয়ে সোজা পার্ক স্ট্রীট যাবো।

হ্যাঁ, সেই ভাল হবে।

রাত্র শোবার পর দুর্বা বলে, যদি আমাদের বিয়ের সময় তাতাই থাকতে পারতো, তাহলে ঠিক আমি তোমার সঙ্গে যেতাম।

বাবাই একটু হেসে বলে, যেতাম মানে? ভাইয়া হুকুম করতো তোমাকে যাবার জন্য।

কয়েক মিনিট কেউই কোন কথা বলে না। তারপর দুর্বা আপনমনেই একটু হেসে বলে, সত্যি, তোমরা সবাই তাতাইকে কি অসম্ভব ভালবাসো।

ও এত ভাল যে ওকে ভাল না বেসে উপায় নেই। তাছাড়া আরো একটা কারণ আছে।

কি কারণ আছে?

ও আমাদের প্রত্যেককেই এমন বিচিত্রভাবে ভালবাসে যে আমরা প্রত্যেকেই মনে করি ও সব চাইতে আমার কাছের মানুষ।

বাবাই মুহূর্তের জন্য থেমেই বলে, এর পর তুমি দেখো, ভাইয়া তোমাকে এমন ভাবে ভালবাসবে, এমন ভাবে কাছে টানবে যে তুমি ওকে ছেড়ে থাকতে পারবে না।

তুমিও দেখো, আমিও ওকে এমন ভালবাসব যে ও নিজেও আমাকে ছেড়ে থাকতে চাইবে না।

ময়না, আমি খুব ভাল করেই জানি, তোমরা দু'জনের কেউই বেশি দিন ছাড়াছাড়ি করে থাকতে পারবে না।

কিন্তু বিয়ের সময় থাকতে পারেনি বলে ও রাগে-দুঃখে আমাকে দূরে সরিয়ে দেবে না তো?

ও রাগ-দুঃখ মান-অভিমান সবকিছুই করবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমাকে কিছুতেই ও দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না।

আবার একটু নীরবতা।

দুর্বা বলে, তুমি কি দিল্লী এয়ারপোর্ট থেকেই সোজা তাতাইয়ের কাছে যাবে?

না, না, তা যাবো না।

কেন?

আমাকে দেখলেই এত হৈ হৈ শুরু করবে যে সেদিনের পড়াশুনা বিশেষ হবে না।

না, তাহলে তোমার যেয়ে কাজ নেই। ফাইন্যালের ঠিক আগের দিনের পড়াশুনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমি সোমবার সকাল ন'টায় ওর হস্টেলে যাবো। তারপর পরীক্ষা শুরু হবার আগে পর্যন্ত ওর সঙ্গে থাকব।

তারপর?

বাবাই একটু হেসে বলে, পরীক্ষা শেষ হবার পর দু'ভাই কোন ফার্স্ট ক্লাস রেস্তোরায় গিয়ে লাঞ্চ খেতে খেতে জমিয়ে আড্ডা দেব।

তারপর?

তারপর ওকে হস্টেলে নামিয়ে দিয়ে একটু আমাদের গেস্ট হাউস ঘুরেই সোজা এয়ারপোর্ট।

বাবাই দিল্লী যায় রবিবার সন্ধের ফ্লাইটে, ফিরে আসে পরের দিন রাত ন'টা নাগাদ।

ও বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই সবাই ওকে ঘিরে ধরেন। সুব্রতবাবু ভারতী ও শিবানী। দুর্বা ওদের পাশে এসে দাঁড়ায়।

সবারই প্রথম প্রশ্ন, তাতাই সোনার পরীক্ষা কেমন হলো?

বাবাই এক গাল হেসে বলে, আমার ভাইয়া কখনও পরীক্ষায় খারাপ করেছে?

ভারতী একটু বিরক্ত হয়েই বলেন, অত ভনিতা না করে বল আজকের পরীক্ষা কেমন হলো?

খুব ভাল, খুব ভাল, খুব ভাল।

ভারতী আর শিবানী সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়েই দু'চোখ বন্ধ করে ঈশ্বরের কাছে কি যেন প্রার্থনা করেন।

দুর্বা বলে, তুমি তাতাইয়ের হস্টেলে কখন গিয়েছিলে?

ন'টায়।

শিবানী প্রশ্ন করেন, তখন ও কি করছিল?

ভাইয়া তখন কাকু আর প্রফেসর রাও-এর ছবি প্রণাম করছিল।

তারপর?

ও ঘুরে দাঁড়াতেই আমাকে দেখে এক লাফে আমার গলা জড়িয়ে ধরেই আমার কোলে চড়ে...

শুনে সবার মুখেই হাসি।

সুব্রতবাবু হাসতে হাসতে বলেন, তোকে কাছে পেলে তাতাই সোনা পাগলামী না করে থাকতে পারে না।

শিবানী বলে, ওকে নির্মাল্য আর প্রসাদ...

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিয়েছিলাম।

বাবাই মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, ভাইয়া নির্মাল্য আর প্রসাদ মাথায় ঠেকিয়ে প্রসাদ মুখে দিল আর নির্মাল্য পকেটে রাখলো।

দুর্বা বলে, তারপর?

আমি ওকে কলম দুটো দিতেই কপালে ছুঁইয়ে এক গাল হেসে ভাইয়া বলল, আমি জানতাম, তুমি আসবে আর আমাকে নতুন কলম দেবে। তোমার কলম দিয়ে পরীক্ষা দিয়েই এতকাল ভাল রেজাল্ট হয়েছে।

দুর্বা আবার বলে, তারপর?

তারপর ওকে পরীক্ষায় হল পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। অন্য যেসব ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে, তাদের সঙ্গে দু'চার মিনিট কথাবার্তা বলার পর আমাকে প্রণাম করে হলে ঢুকে গেল।

ভারতী সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করো, ওকে আশীর্বাদ করেছিলি?

আমি তো ভাইয়াকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করি না। বরাবর ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খাই। আজ সকালেও তাই করেছি।

দুর্বা বলে, পরীক্ষা শেষ হবার পর তাতাইকে নিয়ে খেতে গিয়েছিলে?

গিয়েছিলে মানে?

বাবাই একটু থেমে একটু হেসে বলে, ও হল থেকে বেরিয়েই আমাকে বলল, ভাইদা, আমাকে লাঞ্চ খাওয়াবে তো? হস্টেলের রান্না খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে।

শিবানী জিজ্ঞেস করেন, তোরা কোথায় খেতে গেলি?

ডিপ্লোম্যাটিক এনক্লেভের পিছন দিকে হোটেল ডিপ্লোম্যাটে।

দুর্বা একটু হেসে বলে, ওকে ভাল করে খাইয়েছিলে?

শুধু ওকে কেন? দু'ভাই যেমন জব্বর খেয়েছি, তেমনি জব্বর আড্ডা দিয়েছি।

সুব্রতবাবু বলেন, ওকে হোস্টেলে পৌঁছে দিয়েছিলি তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

শিবানী বলেন, তুই এয়ারপোর্ট রওনা হলি কখন?

ওকে হস্টেলে পৌঁছে দিয়ে গেস্ট হাউস ঘুরেই সোজা এয়ারপোর্ট!

সুব্রতবাবু বলেন, তাতাইসোনার পরীক্ষা শেষ হবে কবে?

ভাইয়ার থিওরি পরীক্ষা শেষ হবে সামনের সপ্তাহের বুধবার। তবে কেস স্ট্যাডি আর অপারেশনের প্রাকটিক্যাল কবে হবে, তা পরে জানাবে।

শিবানী বলেন, তার মানে মাস খানেকের আগে শেষ হবে না।

হ্যাঁ, ছোট মা, তা হয়তো লাগবে।

শুধু থিওরি পরীক্ষার পর না, দু'পর্যায়ে প্রাকটিক্যাল পরীক্ষার পরও তাতাই ফোন করে। সবাই জানতে চায় কবে কলকাতা আসছিস?

কিছু ঠিক নেই।

কেন? এখন তো তোদের ছুটি।

ছুটি হলে কি হয়? প্রফেসর রাও ছাড়লে তো?

উনি পারমিশন দিচ্ছেন না কেন?

উনি যেমন পড়াশুনা করাচ্ছেন, সেইরকমই প্রতিদিন আমাদের অপারেশন করতে হচ্ছে।

তার মানে তোর আসার কোন ঠিক নেই।

না।

তাতাই একটু থেমেই বলে, যেদিন প্রফেসর রাও ছাড়বেন সঙ্গে সঙ্গে পালাব।

শিবানী বলেন, দেখিস, যদি একটু তাড়াতাড়ি আসতে পারিস। সবাই তোর পথ চেয়ে বসে আছে।

মা, আমি কি তা জানি না? আমি যে মুহূর্তে সুযোগ পাবো, আমি সঙ্গে সঙ্গে রওনা হবো।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সাত-দশ দিন তো দূরের কথা, পুরো তিন সপ্তাহ কেটে গেল। তবু তাতাইয়ের দেখা নেই।

পরের রবিবার।

খাওয়া-দাওয়ার পর ভারতী শিবানীর কাছে শুয়ে গল্প করছেন। ও বাড়িতে বাবাই আর দুর্বাও খেয়ে দেয়ে নিজেদের ঘরে শুয়ে শুয়ে কথাবার্তা বলছে। সুব্রতবাবু এক সহকর্মীর গৃহ প্রবেশের নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছেন ; এখনও ফেরেন নি।

হঠাৎ মনে হলো একটা ট্যাক্সি বা গাড়ি এসে বাড়ির সামনে থামল। তারপরই চিৎকার, ও বড়মা। ও মা! আমি এসে গেছি।

এক লাফে বিছানা থেকে নেমে ভারতী আর শিবানী ছুটে যান তাতাইয়ের গলা শুনে।

তিড়িং করে লাফ দিয়ে ওঠে বাবাইও। বলে, ভাইয়া, এসেছে।

দুর্বা বলে, তুমি ঠিক শুনেছ?

বাবাই একটু হেসে বলে, ভাইয়ার গলা চিনব না?

শিগগির চলো।

না, ময়না, এক্ষুনি ওর সামনে যেতে ভয় করছে। মা আর ছোট মা আগে ওকে একটু সামলে নিন তারপর আমি যাবো।

বাবাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কি করে যে ভাইয়াকে মুখ দেখাব, তা

ভেবে পাচ্ছি না।

তুমি না যাও আমি যাচ্ছি।

ময়না, এক্ষুনি যেও না ; একটু পরে যাও।

আমার মনে হয়, যত তাড়াতাড়ি ওকে ফেস করা যায় ততই ভালো।

আমি জানি কিন্তু ফার্স্ট স্টীমটা বেরিয়ে যাক। তারপর আমরা যাবো।

দুর্বা আর কোন কথা বলে না কিন্তু স্থির থাকতে পারে না। একবার এই ঘর, আরেকবার ঐ ঘরের জানলায় সামনে দাঁড়িয়ে ও বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে।

এইভাবে কয়েক মিনিট কাটার পরই ও বলে, আমি আর দেরি করব না; আমি যাচ্ছি।

ও বাড়ির ড্রইংরুমে পা দিয়ে এক পা এগুতেই দুর্বা থমকে দাঁড়ায়।

ওর কানে আসে—কি বললে বড়মা? মেয়েটিকে দেখতে খুব ভালো?

হ্যাঁ, বাবা, সত্যি মেয়েটিকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

বড়মা, পৃথিবীতে আর সুন্দরী মেয়ে নেই? নাকি এই রাজকন্যাই একমাত্র সুন্দরী?

তাতাই না থেমেই বেশ গলা চড়িয়ে বলে, ভাইদা কি কানা-খোড়া? নাকি দেখতে খারাপ? ভাইদা কি মূর্খ নাকি বেকার? নাকি ভাইদা নেশাখোর, লম্পট, চরিত্রহীন?

তা কেন হবে?

ভাইদাকে বিয়ে করার জন্য হাজার হাজার সুন্দরী মেয়ে লাইন দেবে। ভাইদাকে বিয়ে করে যে কোন মেয়ে ধন্য হবে।

না, ভারতী বা শিবানী কোন কথা বলেন না।

আমাকে বললে না কেন? কত সুন্দরী ভাল ভাল ডাক্তার মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। আমি তাদের কাউকে পছন্দ করে ভাইদার সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু তোমরা কি করে আমাকে না জানিয়ে...

বললাম তো বাবা, পরীক্ষার আগে তোর মন বিক্ষিপ্ত হবে বলে আমরা জানাতে পারিনি।

এসব কথা আমাকে বলো না ; এসব কথা শুনে আমার মন ভুলবে না।

ভারতী দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা ধরে বলেন, তাতাইসোনা, তুই মেয়েটাকে দেখ ; নিশ্চয়ই তোর ভাল লাগবে। তাছাড়া ওর গান শুনলে তোর মন ভরে যাবে।

না, না, আমি ওকে দেখতেও চাই না, গানও শুনতে চাই না। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সী হার ফেস।

তুই তোর ভাইদার বউকে না দেখে থাকতে পারবি?

থাকা উচিত না কিন্তু থাকতেই হবে। তোমার পুত্রবধূর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

শিবানী বলেন, তাতাই সোনা, ঐ মেয়েটার তো কোন দোষ নেই। ও নিজে তো বিয়ে করতে চায়নি আমরাই চেয়েছি ওকে আপন করে নিতে।

উনি না থেমেই বলেন, তুই শুধু শুধু ওকে দুঃখ দিবি কেন?

ঠিক সেইসময় সুব্রতবাবু ড্রইংরুমে ঢুকেই দুর্বাকে দেখে বলেন, তাতাই এসেছে?

দুর্বা সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখের সামনে হাত নিয়ে বলে, চুপ। তাতাই এসেছে। যেমন রেগেছে, তেমনই দুঃখ পেয়েছে। বড়মা-ছোটমাকে কত কি বলছে।

সুব্রতবাবু খুব চাপা গলায় বলেন, তুমি ভিতরে যাওনি কেন?

আমার উপরই তো যত রাগ।

ঠিক আছে, আমি দেখছি।

সুব্রতবাবু ওর ঘরে ঢুকতেই তাতাই ছুটে এসে ওনাকে জড়িয়ে ধরেই কাঁদতে কাঁদতে বলে, জ্যেঠু, তোমরা একি করলে? আমি কি তোমাদের কেউ না? বড়মার পেটে হইনি বলে কি আমি ভাইদার ভাই না? আমি তো তোমার আর বড়মার মাঝখানে শুয়ে বড় হয়েছি। আমাকে তোমরা এভাবে দূরে সরিয়ে...

উনি ওর মাথার উপর মুখ রেখে বলেন, তুই স্বপ্নেও ভাবতে পারিস আমরা তোকে দূরে সরিয়ে দেব? তুই যে আমাদের এক টুকরো স্বপ্ন, তা কি জানিস না?

তাই তো জানি কিন্তু...

লক্ষ্মী, বাবা আমার, তুই চোখের জল ফেলিস না। আমি তপুর মৃত্যুর পর তোর মা-র চোখের জল দেখে মাসের পর মাস শান্তিতে ঘুমুতেও পারিনি, খেতেও পারিনি। আমি যতদিন বেঁচে থাকব, তুই কখনই চোখের জল ফেলবি না আমি তোর চোখের জল সহ্য করতে পারব না।

তাতাই তখনও চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলে, কিন্তু জ্যেঠু, আমি যে ভাবতে পারছি না, ভাইদার বিয়ের ব্যাপারে আমি কিছু জানতেও পারলাম না, করতেও পারলাম না।

তাতাইসোনা, তোকে না জানিয়ে, তোকে কাছে না পেয়ে আমরা যে কি করে বাবাইয়ের বিয়ে দিলাম, তা কি তুই বুঝতে পারছিস না?

সুব্রতবাবু প্রায় না থেমেই বলেন, তুই ভাবতে পারিস, আমরা মাত্র সাতজন বরযাত্রী গিয়েছিলাম? তুই ভাবতে পারিস, বৌভাতের দিন মাত্র চল্লিশ-বিয়াল্লিশ জনকে আসতে বলেছিলাম?

ঐ কথা শুনেই তাতাই যেন দপ করে জ্বলে ওঠে—কেন? ভাইদা কি ভিখিরী? নাকি তোমাদের কারুর কিছু নেই?

তুই ছিলি না বলে...

ওনাকে কথাটা বলতে না দিয়েই তাতাই বলে, ওসব কোন কথা না। ভাইদা কি আবার বিয়ে করবে? ভাইদার কি আবার বৌভাত হবে?

দুর্বা আর এক মুহূর্ত দেরি না করে ঐ ঘরে ঢুকেই সুব্রতবাবুকে বলে, ছেলে, তুমি যাও। আমি ওর সঙ্গে কথা বলব।

সুব্রতবাবু ঘর থেকে চলে যেতেই দুর্বা তাতাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, তাতাই, আসামী হাজির। আমাকে কি শাস্তি দেবে, দাও।

তাতাই একটি শব্দ উচ্চারণ করে না। শুধু অবাক হয়ে ওকে দেখে।

দুর্বা বলে, তুমি কি জানো, তোমার ছবি দেখে, তোমার কথা শুনে, তোমার চিঠি পড়ে আমি শুধু তোমাকে দেখার জন্য হা করে বসে আছি?

না, তবুও তাতাই কোন কথা বলে না। শুধু অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

তাতাই, তুমি জানো না, তোমাকে আমি কত ভালবাসি। আজ হয়তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু তুমি স্থির জেনে রাখো, আমি তোমার সব চাইতে কাছের, সব চাইতে আপন হবো।

দুর্বা মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, আমার স্থির বিশ্বাস, তুমিও আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে, আমাকে কাছে টেনে নেবে, আমাকে কখনই তুমি দূরে সরিয়ে দেবে না।

এবার ও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু হেসে ডান হাত এগিয়ে দিয়ে বলে, আমার সঙ্গে হ্যান্ড সেক করো।

এতক্ষণ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দুঃখ আক্ষেপ অভিমান আর রাগের পর তাতাই ঠোঁটের কোনে একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে ডান হাত এগিয়ে দেয়।

হঠাৎ যেন ঐ ঘরের মধ্যে দিয়ে বসন্তের দমকা হাওয়া বয়ে যায়।

দুর্বা এক গাল খুশির হাসি হেসে দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা ধরে দু'গালে চুমু খেয়ে বলে, মাই সুইট বিলাভেড বয়ফ্রেন্ড!

দরজার দু'পাশে দাঁড়িয়ে ভারতী আর শিবানী লুকিয়ে লুকিয়ে সব শুনছিলেন, সব দেখছিলেন। এবার আর ওরা খুশি চেপে রাখতে না পেরে ঘরের মধ্যে হাজির হন।

ভারতী তাতাইকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেই বলেন, এই দৃশ্যটা দেখার জন্যই আমরা সবাই হা করে বসেছিলাম। দুর্বা তোকে ঠিকই বলেছে, ও তোর সব চাইতে কাছের মানুষ হবে আর তুইও ওর সবচাইতে প্রিয়জন হবি।

তাতাই একটু হেসে বলে, আমি যুদ্ধ বিরতিতে রাজি হলাম শুধু তোমাদের জন্য ; এই শ্রীমতীর রূপ দেখে না।

দুর্বা সঙ্গে সঙ্গে তাতাইয়ের দুটো হাত ধরে গেয়ে ওঠে—

আমি রূপে তোমার ভোলাব না।
ভালো বাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো,
গান দিয়ে দ্বার খোলাব॥

তাতাই সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ওঠে—ও বড়মা, এ তো নটী বিনোদিনীর শুরু!

ওর কথা শুনে শুধু ভারতী আর শিবানী না, দুর্বাও হো হো করে হেসে ওঠে।

ছয়

ডাইনিং টেবিলের এক দিকে সুব্রতবাবু আর বাবাই বসার পর পরই তাতাই প্রশ্ন করে, আমার পাশে কে বসবে?

শিবানী বলেন, তোর পাশে শিল্পী বসবে।

আমার পাশে বিনোদিনী বসবে?

তাতাই সঙ্গে সঙ্গেই বলে, অসম্ভব! এই অসামান্যা নটীকে পাশে নিয়ে আমি খেতে পারব না।

দুর্বাও সঙ্গে সঙ্গে চাপা হাসি হাসতে হাসতে তাতাইয়ের একটা কান ধরে বলে, আর যদি আমাকে নটী বিনোদিনী বলেছ তাহলে তোমার পিঠে দুম দুম করে...

তাতাই গলা চড়িয়ে বলে, ও বড়মা, এতো শুধু নটী বিনোদিনী না, এতো আরেক ফুলন দেবী।

ওর কথা শুনে সবাই হেসে ওঠেন।

দুর্বা হাসি থামিয়ে ওকে বলে, আমি তোমাকে সমস্ত মন-প্রাণ-উজাড় করে দিলাম আর তুমি আমাকে...

হোল্ড ইওর টাংগ! ছলনাময়ী!

তাতাই না থেমেই বলে, সমস্ত মন-প্রাণ-হৃদয় দেবে কি করে? আগেই তো ওসব দিয়ে এসেছ তোমার ইহকালের পরকালের বিকাশদাকে।

আবার সবাই হো হো করে হেসে ওঠেন।

দুর্বা কোনমতে হাসি চেপে সুব্রতবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে, ছেলে, আমি বলে দিচ্ছি, তোমরা এই অসভ্য ছেলেকে সামলাও ; তা না হলে...

ঠিক সেই সময় টেবিলের উপর খাবার দাবার দেখেই তাতাই বলে, এইসব রান্নাবান্না দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এখন যেন কেউ আমাকে বিরক্ত না করে।

কিছুক্ষণ পর সুব্রতবাবু বলেন, হ্যাঁরে তাতাই সোনা, তুই দেড়-দু'মাস থাকবি তো?

না, না জ্যেঠু আমি সামনের রবিবারেই ফিরব।

সে. কি?

শিবানী বলেন, মাত্র এক সপ্তাহের জন্য এসেছিস?

হ্যাঁ, তার বেশি থাকার উপায় নেই। প্রফেসর রাও চান না, পাশ করার পর চাকরি-বাকরি শুরু করার আগে একটা দিনও নষ্ট করি।

ভারতী বলেন, তুই আবার কবে আসবি?

জানি না বড়মা। প্রফেসর পারমিশন না দিলে তো আসতে পারব না।

পাঁচ-সাত মিনিট পরে ভারতী প্রশ্ন করেন, তুই প্রফেসরের কাছে ক'দিনের ছুটি চেয়েছিলি?

তাতাই একটু হেসে বলে, আমি আসার ব্যাপারে কিছুই বলেনি। প্রফেসর নিজেই আমাকে তিন হাজার টাকা দিয়ে বললেন, এক সপ্তাহের জন্য কলকাতা ঘুরে এসো। আমি জানি, বাড়িতে সবাই তোমাকে একটু কাছে পাবার জন্য হা করে বসে আছেন।

সুব্রতবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলেন, উনি তোকে ঠিক নিজের সন্তানের মতোই স্নেহ করেন, তাই না?

জ্যেঠু, তার চাইতেও অনেক বেশি। উনি যে আমাকে কি স্নেহ করেন, কি ভালবাসেন, তা বলা যায় না।

আরো কত কথা হয় খেতে বসে।

ওদের খাওয়া শেষ হবার পর ভারতী আর শিবানী খেতে বসেন। ওদের ঠিক সামনে বসে তাতাই।

একটু পরে দুর্বা এসে ডাইনিং টেবিলের পাশে দাঁড়ায়।

টুকটাক নানা কথাবার্তার মাঝখানে দুর্বা বলে, আচ্ছা তাতাই, জ্যান্ত মানুষের পেট কাটতে ভাল লাগে?

তোমার ভুড়ি কাটাকুটি করে যে আনন্দ পাবো, তা কি অন্যের পেট কেটে পেতে পারি?

দেখছ বড়মা, ও পদে পদে আমাকে কেমন অপমান করছে?

আমি তোমাকে অপমান করলাম?

আমার পেটকে ভুড়ি বলে...

ওর কথার মাঝখানেই তাতাই বলে, শুধু ভুড়ি না, তুমি একটি আস্ত আড়াই মনি আলুর বস্তা!

তাতাই!

দুর্বা গলা চড়িয়ে বলেই দু'হাত দিয়ে ওর মাথার চুল ধরে টান দেয়।

আঃ! কি আরাম! এবার পা দুটো টিপে দাও তো।

পা না, আমি তোমার গলা টিপে দেব।

তা তুমি দিতে পারো। আজকাল তোমাদের মত মেয়েরা হরদম এর ওর গলা টিপে খতম করে সোনা-দানা-টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

দুর্বা একটু হেসে বলে, বড়মা, দেখছ, তোমাদের আদরের তাতাইসোনা কনন ডয়েল-ফেলুদার চাইতেও বড় গোয়েন্দা হয়েছে।

তাতাই বলে, বড়মা আলতু-ফালতু মেয়ের কথায় কান না দিয়ে আমার কথা শোনো!

হ্যাঁ, বল।

আমি একেক দিন একেক জনের কাছে শোব।

হ্যাঁ, শুবি ; তোকে কে বাধা দিচ্ছে?

আজ ভাইদার কাছে, কাল জ্যেঠুর কাছে, মঙ্গল, বুধ তোমাদের দু'জনের কাছে, বৃহস্পতি-শুক্র তোমাদের দু'জনের মাঝখানে আর যাবার আগের রাত্রে আবার ভাইদার কাছে...

দুর্বা মুখ টিপে হেসে বলে, আমার কাছে কবে শোবে?

দিনে-দুপুরে মা-বড়মার সামনেই তুমি আমার গলা টিপে মারতে চাইছিলে; তোমার সঙ্গে রাত কাটাবার আগেই আমার হার্ট অ্যাটাক হবে।

যাইহোক ভারতী-শিবানীর খাওয়া শেষ হতেই তাতাই বাবাইয়ের পাশে শুয়ে পড়ে। দু'জনে টুকটাক কথাবার্তা বলে। একটু পরেই দুর্বা এসে তাতাইকে হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে বলে, সরে শোও।

কেন?

আগে একটু সরে যাও ; তারপর বলছি।

তাতাই একটু সরে যেতেই দুর্বা ওর পাশে শোয়।

ভাইদা, প্লীজ পুস হার অফ।

ও কি আমার পাশে শুয়েছে যে ওকে আমি সরিয়ে দেব?

হা ভগবান! কি বিপদে পড়লাম! এমন বেহায়া মেয়ে তো আমি জীবনে দেখিনি।

শেষ পর্যন্ত বাবাইয়ের অনুরোধে আবার ওদের যুদ্ধ বিরতি হয়। তিনজনে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে।

তারপর হঠাৎ উঠে পড়েই দুর্বা ডান হাত দিয়ে তাতাইয়ের গাল টিপে আদর করে আর এক গালে চুমু খেয়ে বলে, বয়ফ্রেন্ড গুড নাইট।

পুরো একটা সপ্তাহ কি করে যে উড়ে গেল, তা কেউই টের পেলেন না। এই সাতদিন যেন স্বপ্নের মতো কেটে গেল।

রবিবার এয়ারপোর্ট রওনা হবার আগে তাতাই জ্যেঠু বড়মা আর মাকে দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে, প্রণাম করে। বলে, সত্যি, প্রাণভরে আনন্দ করলাম এই সাতদিন। তাছাড়া মনের সুখে খেলাম।

ওরা তিনজনেই বলেন, এর মধ্যে যদি আসতে না পারিস, তাহলে রেজাল্ট বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের খবর দিবি।

বাবাই আর দুর্বা পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। ওরা তাতাইকে নিয়ে এয়ারপোর্ট যাচ্ছে।

তাতাই হিপ পকেট থেকে পার্স বের করে বলে, মা, বড়মা, দুই মাসীকে ডাক দাও।

দুই মাসী আসতেই তাতাই ওদের হাতে দু'শ করে টাকা দিয়ে বলে, তোমরা দারুণ খাইয়েছ।

এবার তাতাই পার্স থেকে দু'শ টাকা বের করে দুর্বার সামনে ধরে বলে, মাসীদের দিলাম আর তোমার মত কাজের মেয়েকে দেব না, তা তো হয় না।

সবাই হো হো করে হেসে ওঠেন।

দুর্বা কোন মতে হাসি থামিয়ে বলে, আচ্ছা বয়ফ্রেন্ড, তুমি কি এখনও আমার পিছনে না লেগে শান্তি পাচ্ছো না?

তাতাই চলে যাবার পর সবার মনেই এক বিচিত্র শূন্যতা। সবার মুখেই এক কথা, ও এলে যেন উৎসব শুরু হয়ে যায়। কি আনন্দেই মাতিয়ে রাখে সবাইকে।

দুর্বা বলে, এতদিন শুধু ওর কথা শুনেছি, চিঠি পড়েছি, ছবি দেখছি; তাতেই ওকে ভাল না বেসে থাকতে পারিনি কিন্তু এই এক সপ্তাহ দিন-রাত্তির ওকে কাছে পেয়ে আমি সত্যি পাগল হয়ে গেছি।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, আমি জানতাম ও রূপে গুণে, স্বভাব-চরিত্রে-লেখাপড়ায় ওর তুলনা হয় না কিন্তু ও যে এমন করে সবাইকে ভালবাসতে পারে, কাছে টেনে নিতে পারে, তা ভাবতে পারিনি।

ভারতী বলেন, হ্যাঁ, দুর্বা, তুমি ঠিকই বলেছ।

দুর্বা একটু ম্লান হেসে বলে, তাতাইকে যে ভালবাসবে, তার পক্ষে ওকে ছেড়ে থাকা সত্যি খুব কষ্টকর।

শিবানীও একটু ম্লান হেসে বলেন, তাতো আমরা প্রতি মুহূর্তে মর্মে মর্মে উপলবদ্ধি করি।

পরের দিনই সোমবার। ন'টা থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যেই সুব্রতবাবু, বাবাই আর ভারতী-শিবানী বেরিয়ে গেলেন। দুর্বা ফাঁকা বাড়িতে টিকতে পারে না। সারাদিন শুধু তাতাইয়ের কথা ভাবে।

বিকেলের দিকে ভারতী আর শিবানী কলেজ থেকে ফিরে এলেন।

দুর্বাকে দেখেই ভারতী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, তাতাই চলে যাওয়ায় এমনই মন খারাপ যে আমি আর শিবানী পড়াতে পারিনি।

আমি যে কি করে সারা দুপুর একলা একলা কাটিয়েছি, তাও তোমরা ভাবতে পারবে না। শুধু তাতাইয়ের কথা ভেবেছি।

হ্যাঁ, মা, তা তো হবেই।

একটু পরেই বাবাই ফিরে আসে।

ওকে দেখেই শিবানী বলেন, তুই আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলি?

ছোট মা, তাতাইয়ের জন্য একদম মন ভাল না। আজ কোন কাজে মন লাগেনি। কোনমতে সময় কাটিয়ে চলে এলাম।

কি আশ্চর্য! ছ'টা বাজতে না বাজতেই সুব্রতবাবুও ফিরে এলেন। সবাই অবাক!

দুর্বা প্রশ্ন করে, ছেলে, তোমার কি শরীর ঠিক নেই?

মা জননী, শরীর ঠিকই আছে কিন্তু তাতাই সোনার জন্য...

ওনাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ভারতী বলেন, সবারই এক অবস্থা।

তবু দিন যায়, যায় দিনের পর দিন। দেখতে দেখতে একটা না, দু'-দু'টো মাস কেটে যায়।

সেদিন শনিবার।

বাবাই বাড়ি ফিরেছে সাতটা নাগাদ। সুব্রতবাবু এলেন প্রায় পৌনে আটটায়।

বাবাই চা খেয়ে দশ-পনের মিনিট খবরের কাগজের খেলার পাতা দেখেই বাথরুমে গেল স্নান করতে। স্নান করার পর ও ক্লান্তিতে একটু শোয়।

দুর্বা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলো, কিছু খাবে?

না।

একটু পরেই ভারতী ছেলের ঘরে এসে বলেন, বাবাই, আমি শিবানীর কাছে যাচ্ছি। তোরা খাবার আগে আমাকে ডাক দিস।

আমি টি. ভি. তে একটু খেলা দেখব তুমি ময়নাকে বলে যাও।

হ্যাঁ, ওকেও বলেছি।

যাইহোক আটটা বাজার একটু পরেই বাবাইয়ের মোবাইল বেজে ওঠে।

বাবাই উঠে বসতে বসতেই আপনমনেই বলে, এখন আবার কে ফোন করে?

যাইহোক ও নম্বরটা খেয়াল না করেই বোতাম টিপে বলে, হ্যালো।

ওদিক থেকে তারস্বরে চিৎকার করে তাতাই বলে, ভাইদা, আমি এবারও প্রেসিডেন্টস্ গোল্ড মেডেল পাচ্ছি। একটু আগেই রেজাল্ট বেরল।

বাবাইকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ও উত্তেজিত হয়ে বলে যায়, ন'টায় স্টার নিউজ দেখো। আমি আর প্রফেসর রাও এক্ষুনি ওদের স্টুডিওতে যাচ্ছি। আমাদের ইন্টারভিউ হবে।

তাতাইয়ের কথা শেষ হতেই বাবাই ঘর থেকে ছুটে ছোট মা-র কাছে যেতে যেতে পাগলের মতো চিৎকার করে বলতে শুরু করে, মা! মা! ও ছোটমা! ও বাবা! ভাইয়া আবার প্রেসিডেন্টস্ গোল্ড মেডেল পাচ্ছে। স্টার নিউজে ন'টায় ভাইয়ার ইন্টারভিউ।

সুব্রতবাবু বাথরুম থেকে বেরুবার পর পরই বাবাইয়ের চিৎকার শুনেই বাচ্চা ছেলের মতো লাফাতে লাফাতে ও বাড়ি যেতে যেতে সারা পাড়াকে জানিয়ে দেন, আমাদের তাতাইসোনা হ্যাজ ডান ইট এগেন! তাতাইসোনা হ্যাজ ডান ইট এগেন।

ওদিকে আনন্দে খুশিতে শিবানী আর ভারতী চোখের জলের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন।

শিবানী হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতেই ভারতীকে জড়িয়ে ধরে বলেন, ছেলেটা আমার জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট আজ দূর করে দিল। আজ আর আমার কোন দুঃখ নেই।

আনন্দে খুশিতে দুর্বা স্তব্ধ। ওর শুধু মনে হচ্ছে, ছুটে গিয়ে তাতাইকে জড়িয়ে ধরতে, আদর করতে।

সুব্রতবাবু শিবানীর ঘরে পা দিয়েই চিৎকার করেন, ও বৌমা, তপুর ছবিতে প্রণাম করে বলো, তাতাই সোনা হ্যাজ ডান ইট এগেন! তাতাই সোনা ওর স্বপ্ন সার্থক করেছে।

হ্যাঁ, শিবানী ছুটে গিয়ে স্বামীর বড় ছবিতে মাথা ঠেকিয়ে ঝর ঝর করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলেন, ওগো, তোমার তাতাইসোনা আবার প্রেসিডেন্টস্ গোল্ড মেডেল পাবে। শুধু তোমার আশীর্বাদেই তোমার ছেলে দু'-দু'বার প্রেসিডেন্টস্ গোল্ড মেডেল পেলো।

ওদিকে বাবাই পাগলের মতো চারদিকে ছোটাছুটি করে চিৎকার করে জানিয়ে দিচ্ছে, ভাইয়া আবার প্রেসিডেন্টস্ গোল্ড মেডেল পেয়েছে। ন'টার স্টার নিউজ দেখুন। ভাইয়ার ইন্টারভিউ হবে।

সারা পাড়ার লোক ভেঙে পড়েছে শিবানীর বাড়িতে। ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ী সবার মুখেই এক কথা, সত্যি অকল্পনীয়। তাতাই আমাদের প্রেস্টিজ বাড়িয়ে দিলো।

বাবাইকে হঠাৎ সামনে দেখেই সুব্রতাবু গলা চড়িয়ে বলেন, ওরে, শিগগির টি. ভি. ঠিক কর।

ছোট মা-র ঘরে তো...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সুব্রতবাবু বলেন, ওরে না, না, বৌমার ঘরে না। তপুর ঘরে টি. ভি. থাকবে। তপু স্টার নিউজে ছেলের ইন্টারভিউ শুনবে না?

ও ঘরে তো সবার বসার জায়গা...

সুব্রতবাবু এবার বেশ রেগেই বলেন, ওরে বাবা, আমরা সবাই মেঝেতে বসব।

বাবাই সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের বাড়ির কয়েকজনের সাহায্যে তপোব্রতর ঘরে টি. ভি. এনে সব ব্যবস্থা করে।

মাঝখানে পাঁচ ছ'মিনিট সবাই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে। শুধু ঐ ঘরে না, জানলা-দরজার সামনেও অনেকে দাঁড়িয়ে। সুব্রতবাবু হঠাৎ চিৎকার করেন, বাবাই, সাউন্ড খুব জোরে করে দিবি।

বাবাই আগেই স্টার নিউজ চ্যানেল ঠিক করে সাউন্ড অফ্ করে রাখলো।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসে গেছে।

টি. ভি. স্ক্রীনে নিউজ রিডারের ছবি ভেসে উঠতেই সবাই রুদ্ধশ্বাসে সেদিকে তাকিয়ে।...

দিস ইজ স্টার নিউজ—আয়াম সোনিয়া ভর্মা—দ্য হেডলাইন্স ঃ পাকিস্তানী ইনফিলট্রেটর্স হ্যাভ কিলড থার্টি ফাইভ মেম্বার্স অব এ ম্যারেজ পার্টি ইন জম্মু—ইলেভেন হেভিলি আর্মড টেরোরিস্ট কিলড—তামিলনাড়ু প্রমালগেটেড অর্ডিনান্স টু চেক অ্যাকটিভিটিজ অব এল. টি. টি. ই. সাপোটার্স—ইন্ডিয়া বিট ইংল্যান্ড ইন ফাইন্যাল টেস্ট—রাহুল দ্রাবিড় ম্যান অব দ্য সিরিজ।

সোনিয়া একটু হেসে বলেন, নাউ দেয়ার ইজ এ গুড নিউজ। ডক্টর শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় হাজ ক্রিয়েটেড হিস্ট্রি বাই উইনিং প্রেসিডেন্টস্ গোল্ড মেডেল টোয়াইস—ফার্স্ট ফর গেটিং রেকর্ড মার্কস ইন সার্জারি ইন দ্য ফাইন্যাল এম. বি. বি. এস অ্যান্ড নাউ ফর টপিং ইন এম. এস. একজামিনেশন অব অল ইন্ডিয়া ইনিস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস।...

উই উইল টক টু ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় অ্যান্ড প্রফেসর রাও—এ লিভিং লিজেন্ড ইন দ্যা ফিল্ড অব সার্জারি লেটার অন।...

বিশদ খবর পড়া শুরু হতেই বাবাই শিবানীকে জড়িয়ে ধরেই চিৎকার করে ওঠে, ছোটমা, ভাইয়া আমাদের পাগল করে দেবে।

শুধু ঘরের ভিতর না, চারদিকে কত লোকজন কিন্তু কারুর মুখে কোন কথা নেই। সবাই মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ তবে সবার চোখেই আনন্দাশ্রু।

বিস্তৃত খবরের পর খেলার খবরও শেষ হলো।

এইবার ভাইয়া আসবে।

সুব্রতবাবু গর্জে ওঠেন, চুপ কর।

না বিজ্ঞাপনের বিরতি।

আবার টি-ভি'র পর্দায় সোনিয়া ভার্মার ছবি ভেসে ওঠে ; কয়েক মুহূর্ত পরই দেখা যায় তাতাই আর প্রফেসর রাও-কে।...

নাউ লেট মী ইন্ট্রোডিউস—অন মাই রাইট ইজ ডক্টর শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়...

ও সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত জোড় করে নমস্কার করে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি দর্শক-শ্রোতাদের।

...অ্যান্ড অন মাই লেফট ইজ প্রফেসর রাও।

সোনিয়া তাতাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, নাউ টেল আস ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় হু ইনস্পার্ড ইউ মোস্ট টু অ্যাচিভ দিস হিস্টোরিক সাকসেস।

...ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং, আই ডোন্ট নো এনিথিং অ্যাবাউট ক্রিয়েটিং হিস্ট্রি। ইয়েস আই হ্যাভ ডান ওয়েল। টু পার্সনস্, হ্যাভ ইনস্পায়ার্ড মী। ফার্স্ট—মাই ফাদার লেট ডক্টর তপোব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। উনি ফাইন্যাল এম. বি. বি. এস. পরীক্ষায় সার্জারিতে রেকর্ড নম্বর পেয়ে গভর্নরস্ গোল্ড মেডেল পাবার পর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির এম. এস. পরীক্ষায় প্রথম হবার জন্য দ্বিতীয় বারও গভর্নরস্ গোল্ড মেডেল পান...

...আই সী...।

...উনি এম. এস. পাশ করার দু'চার বছরের মধ্যেই কলকাতার একজন বিশিষ্ট সার্জেন হিসেবে পরিচিত লাভ করেন। আনফরচুনেটলি হি ডায়েড ইন অ্যান অ্যাকসিডেন্ট হোয়েন হি ওয়াজ ওনলি থার্টিওয়ান।

...ও মাই গড!

তাতাই একটু ম্লান হেসে বলে, আই ওয়াজ বর্ন ফিউ মান্তস্ আফটার মাই ফাদার্স ডেথ।

...ইউ আর এ পসথুমাস চাইল্ড?

...ইয়েস, আই অ্যাম।

তাতাই দু'চার সেকেন্ড থেমেই বলে, আই ডোন্ট থিংক আই হ্যাভ মাচ টাইম টু টক অ্যাবাউট হিম তবু একটা বিশেষ ব্যাপার না বলে পারছি না।...

...ইয়েস, প্লীজ টেল আস।

...যাস্ট সেকেন্ডস্ বিফোর স্টার্টিং অপারেশন, স্ক্রাব নার্স গিভ মী দ্য স্ক্যালপেল—ফর ওপেনিং দ্য অ্যাবডোমেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিই চারদিকে দেখে নিই লাইফ সেভিং সিস্টেম আর পাশের সহকর্মী ও নার্সদের। ঠিক সেই মুহূর্তে আমি দেখি, বাবা সামনে দাঁড়িয়ে একটু হেসে ইসারা করে বলেন, শুরু করো। ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুরি দিয়ে পেট কাটতে শুরু করি।

...দেন?

...অপারেশনের শেষে স্ক্রাব নার্সের হাতে নিডল আর ক্যাট্‌গাট্ ফেরত দেবার পর মুখ তুলতেই দেখি বাবা এক গাল হেসে থামস্ আপ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পারি, ইয়েস, অপারেশন ইজ সাকসেসফুল!

সোনিয়া বলে, রিয়েলী ভেরি ইনস্পায়ারিং! নাউ হু ইজ দ্য সেকেন্ড পার্সন

টু ইনস্‌পায়ার ইউ?

...মাই টিচার, মাই গুরু, মাই ফস্টার ফাদার অ্যান্ড মাই দেবতা প্রফেসর রাও! আই কান্ট টক অ্যাবাউই হিম, আয়াম নট কোয়ালিফায়েড টু টক অ্যাবাউট হিম। তবে শুধু একটুকু বলি, হস্টেলে আমার পড়ার টেবিলে মাত্র দু'জনের ছবি আছে।

কার কার?

আমার বাবার আর প্রফেসর রাও-এর। আমি রোজ ঘুম থেকে উঠে ওদের দু'জনকে প্রণাম করি ; আবার রাত্রে ঘুমুতে যাবার আগে আমি আমার দুই পরম আরাধ্য দেবতার ছবিতে প্রণাম করি।...

...রিয়েলী ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভেরি ইন্সপায়ারিং। সোনিয়া সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করে, হোয়াট অ্যাবাউট ইওর ফ্যামেলী মেম্বার্স?

...তাতাই এক গাল হেসে বলে, ইয়েস! ফার্স্ট মাই গ্রেট জ্যেঠু...

ইওর সিনিয়র আংকল?

দ্যাটস্ রাইট। হিজ লাভ, অ্যাফেকশান, অ্যান্ড টলারেন্স ফর অল মাই হুইমজিক্যাল অ্যাকটিভিটিজ ইজ অ্যাজ ভাস্ট অ্যাজ স্কাই, অ্যাজ ডিপ অ্যাজ আটলান্টিক।

দেন?

আয়াম এক্সট্রিমলি ফরচুনেট টু হ্যাভ টু মাদার্স—বড়মা অ্যান্ড মা।

সোনিয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে, বড়মা ইজ ইওর সিনিয়র আংকলস্ ওয়াইফ?

...দ্যাটস রাইট। মা আমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন কিন্তু আমি দু'জনেরই বুকের দুধ খেয়েছি। মা কলেজে গেলে...

ইজ সী এ প্রফেসর?

মা-বড়মা দু'জনেই ঐতিহাসিক বেথুন কলেজের লেকচারার।

ইয়েস গো অন।

আমি যখন খুব ছোট, তখন একজন কলেজে যেতেন। আরেকজন আমাকে দেখতেন। আমার চাইতে আমার দাদা পাঁচ বছরের বড়। তাইতো আমি যখন জন্মেছি, তখন বড়মার বুকে দুধ ছিল না। কোন কারণে আমি খুব কান্নাকাটি করলেই বড়মা আমাকে স্তন্য দান করতেন কিন্তু কি আশ্চর্য! দুধ না থাকলেও বড়মার স্তন্যপান করে আমি নিশ্চয়ই এমন কিছু আনন্দ তৃপ্তি বা শান্তি পেতাম যে আমার কান্না থেমে যেতো।

তাতাইয়ের ইন্টারভিউ চলার সময় পিছন দিক থেকে কে যেন ফ্ল্যাশ জ্বেলে ছবি তোলে কিন্তু কেউই পিছনে ফিরে দেখেন না। সে অবকাশ কারুর নেই।

আবার তাতাই বলে, রাতের শিশির চোখে দেখা যায় না কিন্তু সকালে ভিজে ঘাস দেখে জানা যায় সারা রাত শিশির পড়েছে। মা আর বড়মা ঠিক রাতের শিশিরের মতোই দিবারাত্র আমাকে আশীর্বাদ করে থাকেন। এদের দু'জনের

আশীর্বাদই আমার জীবনের সব চাইতে মূল্যবান পুঁজি।

হোয়াট অ্যাবাউট ইওর এলডার ব্রাদার?

ইয়েস মাই ভাইদা! হি ইজ এভরিথিং টু মী। হি ইজ মাই ফ্রেন্ড-ফিলজফার-অ্যান্ড গাইড। আই কান্ট প্লে উইদাউট হিম, আই কান্ট এনজয় উইদাউট হিম, আই কান্ট শ্লিপ উইদাউট হিম, আই কান্ট এনটার একজাম হল উইদাউট সীয়িং হিজ ফেস, আই কান্ট অ্যাপিয়ার উইদাউট হিজ পেন...

তাতাই সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে দুটো পেন দেখিয়ে বলে, অন্যান্য পরীক্ষার মতো এবারও পরীক্ষা শুরু হবার দিন সকালে যথারীতি ভাইদা আমার হস্টেলে এসে হাজির ও দুটো নতুন দামী কলম দিলো।...

ও একটু হেসে বলে, ভাইদার দেওয়া কলম দিয়ে পরীক্ষা দিই বলেই আমার রেজাল্ট এত ভাল হয়।

সোনিয়া দৃষ্টি ঘুরিয়ে বলে, প্রফেসর রাও, ইউ হ্যাভ সীন মেনি মেনি গুড স্টুডেন্টস্ অব সার্জারি। হোয়াট ইজ দ্য স্পেশালিটি অব ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়?...

...ইয়েস শুভ ইজ স্পেশ্যাল। অর্জুনের লক্ষ্যভেদের কথা সবাই জানে। অর্জুন ঐ মাছের চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি, ঠিক সেই রকমই হচ্ছে শুভর ডেডিকেশান টু সার্জারি।...

সোনিয়া একটু হেসে বলে, ইউ কল হিম শুভ?

ইয়েস! নো ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় টু মী, নট ইভন শুভব্রত।

প্রফেসর রাও মুহূর্তের জন্য থেমেই বলেন, শুভ'র ধ্যান-জ্ঞান-ভালবাসা হচ্ছে সার্জারি ; সার্জারি ওর প্রেম, সার্জারি ওর স্বপ্ন, সার্জারি ওর দেবতা।

হোয়াট এ গ্রেট কম্প্লিমেন্ট ফ্রম এ লিজেন্ডারী প্রফেসর টু হিজ হিস্ট্রি-মেকিং স্টুডেন্ট!

সোনিয়া সঙ্গে সঙ্গেই বলে, এনিথিং এলস্, প্রফেসর রাও?

ইয়েস!

প্রফেসর রাও চোখ দুটো বড় বড় করে বলেন, অপারেশনের সময় শুভ'র হাত আর আঙ্গুলের মুভমেন্ট দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই।...

হোয়াই?

মুভমেন্টস্ আর সো ডেলিকেট অ্যান্ড আর্টিস্টিক যা ভারত নাট্যমের বিখ্যাত ডান্সারদের মধ্যে দেখা যাবে না।...

ডিড হি লার্ন অল দিজ ফ্রম ইউ?

নো নো, ইট ইজ পিওরলি জেনেটিক। শুভ এই অসামান্য ক্ষমতা পেয়েছে তাঁর বিখ্যাত বাবা ও অসামান্যা গর্ভধারিণীর কাছ থেকে। অভিমন্যু যেমন মাতগর্ভে থাকার সময়ই যুদ্ধবিদ্যা শিখেছিল, ঠিক সেইরকম মাতৃগর্ভে থাকার সময়ই শুভ এই অনন্য দক্ষতা অর্জন করে।

সোনিয়া মুহূর্তের জন্য থেমেই বলে, প্রফেসর রাও, হোয়াট ডুইউ থিংক অব ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়স্ ফিউচার?

সোনিয়া, তোমাকে আর তোমার মাধ্যমে সারা দেশকে আমি বলে দিচ্ছি, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে শুভ ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সার্জেন হবেই হবে।

সোনিয়া ডান দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়েই বলে, বাই দ্য ওয়ে ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় ডু ইউ প্ল্যান টু ওয়ার্ক ইন ইউনাইটেড স্টেটস্ হোয়ার ইউ উইল হ্যাভ বেটার ফেসিলিটি'জ অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আর্ন মোর?

তাতাই বেশ জোর করেই বলে, সার্টেনলি নট। আই মে গো অ্যাব্রড ফর প্রফেশন্যাল রিজন বাট আই উইল নেভার নেভার গো টু এ ফরেন কান্ট্রি টু আর্ন ইভন এ পেনি।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, ডাক্তারী-এঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে সমস্ত বিষয়ের উচ্চশিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় বা সমস্ত রাজ্য সরকার প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে। এই টাকা আসে পাহাড়ের দুর্ভেদ্য জঙ্গলের বস্ত্রহীন আদিবাসী, সব চাইতে অনুন্নত গ্রামের দরিদ্রতম পরিবার থেকে মালাবার হিলস্-এর সহস্র সহস্র কোটিপতির কাছ থেকে।...

ইয়েস ইউ আর রাইট।

প্রফেসর রাও হ্যাজ নট ওনলি টট্ আস সার্জারি, হি হ্যাজ অলসো টট্ আস্ টু লাভ দিস্ কান্ট্রি অ্যান্ড কান্ট্রিমেন। আমি আমার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমার দেশের মানুষের সেবা করব।

ভেরি গুড!

আরো একটা কথা বলতে চাই।...

ইয়েস টেল আস।

আমি শুধু বাধাধরা ডিউটি আওয়ার্সে কাজ করব না। খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করার পর আবার হাসপাতালে যাব এবং ইর্মাজেন্সী ও অপারেশন থিয়েটারে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাবো। যেখানে সে সুযোগ পাবো না, সেখানে কাজ করব না।

আর ইউ রেডি টু গো টু ভিলেজেস?

সার্টেনলি।

তাতাই দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে, আমি যদি আমার গুরুর কণা মাত্র আশীর্বাদ পেয়ে থাকি তাহলে মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারি, কোন বড় শহরের চাকচিক্য, বড় হাসপাতাল আর বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে আমাকে কেনা যাবে না।

ও মুহূর্তের জন্য থেমেই বলে, তাছাড়া আমি কখনই অনন্তকাল চাকরি করব না। কিছুকাল চাকরি করার পর আমি আমার সাধ্যমতো দেশের মানুষের সেবা

করবো।

সোনিয়া খুশির হাসি হেসে বলে, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় ফর ইওর ইনস্পায়ারিং ইন্টারভিউ প্রফেসর রাও, উই আর রিয়েলী ভেরি হ্যাপি দ্যাট ইউ কুড ম্যানেজ টু কাম টু আওয়ার স্টুডিও।

সোনিয়া মুহূর্তের জন্য না থেমেই বলে, দেয়ার ইজ এ ফ্লাশ! প্রেসিডেন্ট ডক্টর এ-পি-জে আবদুল কালাম অ্যান্ড প্রাইম মিনিষ্টার অটল বিহারী বাজপেয়ী হ্যাভ সেন্ট মেসেজেস অব কনগ্রাচুলেশনস্ টু ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় ফর দিজ রিমার্কেবল অ্যাচিভমেন্ট। ডিটেলস্ অব দা মেসেজেস্ আর কামিং ইন।...দ্যাটস অল ফর দ্য মোমেন্ট! গুড বাই!

আনন্দে খুশিতে গর্বে সবার বুক ভরে যায়। সবার চোখেই জল! সঙ্গে সঙ্গে কতজনের কত গুঞ্জন। এরই মধ্যে শিবানী আস্তে আস্তে এগিয়ে যান স্বামীর বড় ছবির সামনে। কয়েক মুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন স্বামীর দিকে। তারপরই হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতেই হঠাৎ চিৎকার করে বলেন, শুনলে? শুনলে তোমার ছেলের কথা? তুমি আমাদের সবাইকে ফাঁকি দিয়েছ, সবাইকে ঠকিয়েছ কিন্তু ছেলেকে ফাঁকি দিতে পারলে না। সারাজীবন তুমি ছেলের কাছে বন্দী থাকবে; কোনদিন তুমি ওর কাছ থেকে পালাতে পারবে না।

হঠাৎ কে যেন আবার ছবি তোলে।

বাবাই তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ফটোগ্রাফার ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে, আপনিই কি আগেও ছবি তুলছিলেন?

হ্যাঁ।

কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারছি না।

আমি স্টেটস্ম্যান থেকে এসেছি।

স্টেটস্ম্যান?

হ্যাঁ।

বসুন, বসুন।

না, না, আমি বসব না।

স্টেটস্ম্যানের ফটোগ্রাফার মুহূর্তের জন্য থেমেই বলেন, আমি ঘণ্টা খানেক আগেই অফিস থেকে বাড়ি ফিরেছি। যেহেতু আমি এই সল্টলেকেই থাকি, তাই অফিস থেকে ফোন করে আপনাদের এখানে আসতে বলল।

আপনি একটু মিষ্টি মুখ না করে...

প্লীজ আমাকে এক্ষুনি অফিসে গিয়ে এই ছবি তৈরি করে দিতে হবে।

উনি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যান।

এদিকে টেলিফোনের বিরাম নেই। আবার বাড়ির সামনে লোকে লোকারণ্য!

বাবাই চিৎকার করে, ময়না, বাবার ঘরে টেলিফোন বাজছে শুনতে পাচ্ছো না?

পাড়ার এক মাসীমা বলেন, দুর্বা শিবানীর টেলিফোন অ্যাটেন্ড করছে।

বাবাই এদিক-ওদিক তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বলে, এই শিখা, তুই বাবার ঘর থেকে কর্ডলেস আর আমার মোবাইল...

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবাইদা, ধরছি।

কিন্তু যেভাবে দুটো টেলিফোনই বেজে চলেছে, ও দুটো টেলিফোন সামলাবে কি করে?

শিখা কর্ডলেসে কথা বলতে বলতেই ইসারায় তানিয়াকে ডেকে মোবাইলটা ওর হাতে দেয়।

কতজনের ফোন আসে তার ঠিকঠিকানা নেই। বেথুনের অধ্যক্ষা-লেকচারার প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রী থেকে শুরু করে জানা-অজানা অসংখ্য মানুষের কাছ থেকেও। আরো আরো অনেকের ফোন আসে।

সবাইকেই বলা হয়, বাড়িতে ও বাড়ির সামনে লোকে লোকারণ্য; এখন শিবানী দেবীর পক্ষে কথা বলা অসম্ভব।

এরই মধ্যে পর পর এসে হাজির আনন্দবাজার, টেলিগ্রাফ, প্রতিদিনের রিপোর্টার-ফটোগ্রাফাররা।

হঠাৎ এসে হাজির মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। উনি শিবানী, ভারতী আর সুব্রতবাবুর গলায় খুব সুন্দর তিনটে মালা পরিয়েই ওদের প্রণাম করে বলেন, আপনাদের ছেলের জন্য আজ সারা দেশের কাছে পশ্চিম বাংলার মুখ উজ্জ্বল হলো। আর সল্টলেকের সবাই মনে করছে, তাদের ঘরের ছেলে ভারত জয় করেছে।

উনি বেরিয়ে যেতে না যেতেই সল্টলেক পৌরসভার চেয়ারম্যান আর অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত এসে হাজির। ওরা বিদায় নিতে না নিতেই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অম্লান দত্ত রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির এক দুর্লভ ছবি নিয়ে হাজির। ঐ ছবিটা শিবানী দেবীর হাতে দিয়ে বলেন, চিকিৎসা জগতে শুভব্রত বাঙ্গালির দুর্নাম ঘুচিয়ে এক নয়া নজীর সৃষ্টি করলো। গুরুদেব আর গান্ধীজির এই দুর্লভ ছবিটা ছেলেকে দিয়ে বলবেন, এই দু'জন অসামান্য মহাপুরুষের মতো ওকেও বিশ্বের দরবারে দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে হবে।

ঠিক এই মুহূর্তেই সারা ঘর দিনের আলোয় ভরে গেল ছ'সাতটি টি. ভি. ক্যামেরায় ছবি তোলার জন্য।

ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে মিষ্টি বিতরণ। সবার মুখেই মিষ্টি কিন্তু কেউ জানে না কারা কিনেছে, কারা দিচ্ছে।

বাড়ির সামনে তখন সব বয়সের হাজার হাজার নারী-পুরুষের ভীড়।

হাজির মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ; হাতে জবা ফুলের মালা ও আরো কি যেন।

গাড়ি থেকে নামলেন আরো কয়েকজন। তাদের মধ্যে চারজনের হাতে চারটি হাঁড়ি আর অন্যদের হাতে বিরাট বিরাট ফুলের মালা।

শিবানী আর ভারতীকে প্রণাম করে ওদের দু'জনের কপালে কালীঘাটের মায়ের সিঁদুর দেবার পর মায়ের গলার মালা দেন ওদের হাতে। তারপর দু'জনের গলায় বিরাট দুটো মালা পরিয়ে দু'জনের হাতে দু'হাঁড়ি মিষ্টি দিয়ে মমতা বলেন, আজ থেকে আপনারা দু'জনে সমস্ত বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের মা-বড়মা হলেন। আর একটা কথা।

ওরা দু'জনেই মমতার মুখের দিকে তাকান।

মমতা বলেন, আজ পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েদের মনে বড় হতাশা; ওরা যেন অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। শুভব্রত এইসব ছেলেমেয়েদের মনে নতুন আশা জাগিয়ে দিল, ওদের মুখে হাসি আর মনে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে।

মমতা সুব্রতবাবুকে প্রণাম করে গলায় মালা পরিয়ে হাতে মিষ্টির হাঁড়ি দিয়ে বলেন, আজ আপনাদের ছেলে প্রমাণ করে দিল, বড় হতে হলে চাই জ্যেঠু-বড়মা, চাই ভাইপো, চাই সংসারে অনেক গুরুজন, অনেক দাদা-দিদি।

ঠিক বলেছেন।

মমতা বাবাইয়ের গলায় মালা আর হাতে মিষ্টির হাঁড়ি দিয়ে বলেন, তুমি কিন্তু আমারও ভাইদা; তোমাকে আমি হাতছাড়া করতে পারব না।

মমতা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ভারতী-শিবানীর দিকে তাকিয়ে বলে, ভাইদার বিয়ে হয়নি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়েছে।

দুর্বা পাশেই ছিল। ওকে দেখিয়েই শিবানী বলেন, এই হচ্ছে ভাইদার স্ত্রী।

ওর দু'হাত ধরে মমতা একগাল হেসে বলেন, তার মানে তুমিই শুভব্রত'র গার্লফ্রেণ্ড!

দুর্বা এক গাল হেসে বলে, আমি ওর প্রেয়সী, ও আমার বয়ফ্রেন্ড।

মমতা সারা মুখে খুশির হাসি ছড়িয়ে বলেন, একে এই মা-বড়মা, তারপর ওই জ্যেঠু, তার উপর ভাইদা ছাড়াও এইরকম অসাধারণ সুন্দরী প্রেয়সী না পেলে কি শুভব্রত হওয়া যায়?

মমতা চলে যাবার দশ মিনিটের মধ্যেই পুলিশের পাইলট গাড়ির হর্নে মুখরিত হয়ে ওঠে চারদিক। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় এসে থামে শুভব্রতদের বাড়ির সামনে। আগে থেকেই পাঁচ-ছ'জন পুলিশ ছিল বাড়ির সামনে। মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছবার কয়েক মিনিট আগেই এক দল পুলিশ নিয়ে এসেছেন এস. পি.। মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি থামার আগেই জিপসীগুলো থেকে লাফ দিয়ে নেমেছে কার্বাইনধারী কামান্ডো বাহিনী। মুখ্যমন্ত্রীর পার্সোন্যাল সিকিউরিটি অফিসার বিদ্যুত গতিতে গাড়ির সামনে থেকে নেমেই খুলে ধরেন পিছনের দরজা। গাড়ি থেকে

নামলেন বুদ্ধদেব ভট্টচার্য। পিছনে এক সিকিউরিটি অফিসারের হাতে সুন্দর এক বাস্কেট ফুল।

বুদ্ধদেববাবু একবার দু'হাত জোড় করে সমবেত জনতাকে নমস্কার করেই শিবানী দেবীর বাড়িতে ঢুকে যান।

শিবানী দেবীর হাতে ফুলের বাস্কেট তুলে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্টার টি. ভি'তে খবর আর শুভব্রতর ইন্টারভিউ শুনলাম। নিঃসন্দেহে ও অভাবনীয় কৃতিত্ব অর্জন করেছে কিন্তু অনেক বেশি ভাল লেগেছে দেশে থেকে দেশবাসীর সেবা করার সঙ্কল্পর কথা শুনে। ঠিক এই ধরনের ছেলেমেয়েই আজ আমাদের দরকার।

বুদ্ধদেববাবু একটু থেমে বলেন, আর একটা বলে যাই। শুভব্রত যদি পশ্চিমবঙ্গে কাজ করতে চায়, তাহলে ব্যক্তিগতভাবে আমি ও আমাদের সরকার সব রকম সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছি।

শিবানী বলেন, ও ফোন করলেই আমি আপনার কথা জানিয়ে দেব।

মুখ্যমন্ত্রী এবার বলেন, একটা জরুরী আলোচনার মাঝখানেই আমি চলে এসেছি। তাই আমি আর থাকতে পারছি না। এখনই যাচ্ছি। তবে দরকার হলে অফিসে বা বাড়িতে ফোন করবেন।

উনি সবাইকে নমস্কার করে বিদায় নেন।

মুখ্যমন্ত্রীচলে যেতেই খবরের কাগজের রিপোর্টার ফটোগ্রাফার আর টি. ভি.-র রিপোর্টার ক্যামেরাম্যানরাও বিদায় নেন কিন্তু বাড়ির সামনে তখন কয়েক হাজার মানুষ। সবার দাবী-মা-বড়মা, জ্যেঠু আর ভাইদাকে দেখব। অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা ওদের প্রণাম করতেও চায়।

যাইহোক আশেপাশের বাড়ির সজল, প্রদীপ্ত, শিখা, তানিয়া আর মাধুরীবৌমার একান্ত অনুরোধে আস্তে আস্তে ভীড় কমতে শুরু করে।

স্নান করে সবাই যখন খেতে বসলো তখন রাত প্রায় একটা বাজে।

তারপরও কি ওদের চোখে ঘুম আসে?

আজ শিবানীর এক পাশে ভারতী, আরেক দিকে দুর্বা। শিবানী বলেন, আমরা সবাই এমন একটা দিনের জন্য এতগুলো বছর অপেক্ষা করছিলাম, তাই নারে ভারতী?

তাতাই সোনা এমনভাবে একটা ইতিহাস সৃষ্টি করে রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী থেকে সাধারণ মানুষকে পর্যন্ত মুগ্ধ করবে, তা হয়তো আমরা ভাবিনি কিন্তু ও যে অসাধারণ কিছু করবে, তা তো আমরা সবাই জানতাম।

দুর্বা বলে, তবে তোমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, বহু পূণ্যের ফলে প্রফেসর রাও-এর মত অসামান্য অধ্যাপকের অমন অভাবনীয় স্নেহ-ভালবাসা পাওয়া যায়।

ভারতী সঙ্গে সঙ্গে বলেন, তবে তাতাই সোনার মত হনুমান ভক্ত ছাত্র পাওয়াও খুব দুর্লভ ব্যাপার।

এইসব টুকটাক কথাবার্তা বলতে বলতেই শিবানী আর ভারতী ঘুমিয়ে পড়েন কিন্তু ঘুম আসে না দুর্বার। জানলা দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে আবছা চাঁদের আলোয় দূরের কৃষ্ণচূড়া গাছ দেখতে দেখতে কত কি মনে হয়। ওর মন ছটফট করে বয়ফ্রেন্ডকে একটু কাছে পাবার জন্য, প্রাণভরে আদর করার জন্য। বার বার বলতে ইচ্ছে করে, বয়ফ্রেন্ড, সত্যি আমি তোমাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। তুমি যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছ, তার জন্য আমার যেমন আনন্দ হচ্ছে, ঠিক সেইরকম গর্ব হচ্ছে।

পরদিন কলকাতার সব খবরের কাগজের শুধু প্রথম পাতায় না, অধিকাংশ কাগজেরই প্রথম পাতার প্রধান খবর তাতাইয়ের ইতিহাস সৃষ্টি। সঙ্গে দু'তিনটেছবি। স্টেটসম্যান ছেপেছে স্বামীর ছবির সামনে শিবানী। টেলিগ্রাফ খুব বড় করে ছেপেছে মুখ্যমন্ত্রী আর শিবানীর ছবি ; আনন্দবাজার আর প্রতিদিন ছেপেছে শিবানীদের সঙ্গে মমতা ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ছবি। সব কাগজেই মোটা মোটা অক্ষরে ছাপা হয়েছে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও মহারাষ্ট্র কর্নাটক অন্ধ্র তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীদের শুভেচ্ছা বার্তা।

বাবাই আর দুর্বা খবরের কাগজগুলো পড়ছিল ; শুনছিলেন সুব্রতবাবু, ভারতী আর শিবানী।

হঠাৎ বাবাই বেশ জোরেই বলে, ও ছোটমা, কাল রাত্তিরেই হস্টেলে গিয়ে ভাইয়াকে অভিনন্দন জানিয়েছেন হেলথ মিনিষ্টার শত্রুঘ্ন সিন্‌হা, তপন সিকদার আর দিল্লির চীফ মিনিষ্টার।

ঠিক সেই সময় শিবানীর ঘরের টেলিফোন বেজে ওঠে।

মা!

তাতাইসোনা!

ছেলের কণ্ঠস্বর শুনেই উত্তেজনায় চিৎকার করে ওঠেন শিবানী।

সবাইকে ডাক দাও।

সবাই এখানে আছে।

সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন টেলিফোনের সামনে।

তাতাই বলে, জ্যেঠু আমার কথা শুনতে পারছো?

সুব্রতবাবু বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবাই শুনতে পারছে।

ও জ্যেঠু দারুণ খবর আছে।

আবার দারুণ খবর?

সুব্রতবাবু উত্তেজিত না হয়ে পারেন না।

তাতাই বোধহয় হাসতে হাসতেই একটু উত্তেজিত হয়ে বলে, প্রেসিডেন্ট ডক্টর কালাম নিজের হাতে চিঠি লিখে আজ রাত্তিরে আমাকে আর স্যারকে ডিনারে

নেমন্তন্ন করেছেন।

সবাই এক সঙ্গে বলেন, বলিস কিরে?

হ্যাঁ, জ্যেঠু, আমিও অবাক হয়ে গেছি। তবে উনি তো ভি. ভি. গিরি-ফকরুদ্দীন বা সঞ্জীব রেড্ডীর মতো না ; ডক্টর কালাম যে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের সব চাইতে ভাল বন্ধু, তা তো সবাই জানে।

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রেসিডেন্টের ডেপুটি মিলিটারী সেক্রেটারি কর্নেল ডি'সুজা নিজে এসে এই মাত্র ঐ চিঠি দিয়ে বললেন, আমাকে আর স্যারকে নিয়ে যাবার জন্য আসবেন ঠিক সাতটায়। ডক্টর কালাম ডিনারের আগে অন্তত এক-দেড় ঘণ্টা আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন।

শিবানী বলেন, তাতাই সোনা, তোর সম্মানের কথা যত শুনছি, ততই আমাদের গর্বে বুক ভরে যাচ্ছে।

বাবাই চিৎকার করে বলে, ভাইয়া, কাল রাত্তিরে ছোট মা-র কাছে বুদ্ধদেব ভট্টচার্য; মমতা ব্যানার্জী, সুভাষ চক্রবর্তী, প্রফেসর অম্লান দত্ত থেকে আরো কতজন ছাড়াও হাজার হাজার মানুষ এসেছিল...

বলো কি ভাইদা?

আজ কলকাতার সব কাগজের প্রথম পাতার প্রধান খবর তুই; অনেক ছবিও ছাপা হয়েছে।

তার মানে কলকাতার লোক খুশি?

ভারতী বলেন, খুশি কিরে! আনন্দে গর্বে সবাই ভেসে যাচ্ছে।

সুব্রতবাবু প্রশ্ন করেন, হ্যাঁরে, তাতাই সোনা, দিল্লির কাগজে তোর খবর ভাল করে ছেপেছে?

হ্যাঁ, দিল্লির সব কাগজেই প্রথম পাতায় আমার ছবি দিয়ে খবর ছেপেছে।

শিবানী বলেন, ওরে, তুই দু'একদিনের জন্য আমাদের কাছে আসবি না?

আসব তো নিশ্চয়ই ; তবে কবে আসব, তা এখনই বলতে পারছি না।

দুর্বা বলে, বয়ফ্রেন্ড, প্লীজ তাড়াতাড়ি এসো ; আমরা আর ধৈর্য ধরতে পারছি না।

প্রেয়সী, আমি কলকাতায় এসেই তোমাকে নিয়ে সোজা সুইজারল্যান্ড যাবো।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসো ; আমি রেডি।

ভাইদা হাউ হাউ করে কান্নাকাটি করবে না তো?

ও যা ইচ্ছে করুক ; আমরা চলে যাবো।

না, প্রেয়সী, তা হয় না। আমরা সুইজারল্যান্ড গেলে ভাইদাকে ধেই ধেই করে নাচতে হবে।

ওর কথা শুনে সবাই হেসে ওঠেন।

দ্বিতীয় পর্ব

সেই স্কুলে পড়ার সময় আমার ডায়েরী ছিল। তাতে লিখতে হতো কবে কি পড়া, কি কি হোম-টাস্ক করতে হবে, স্কুলে কবে কোন উৎসব, নানা প্রতিযোগিতায় নাম দেবার দিন, কবে কোন ছুটি ইত্যাদি ইত্যাদি এইসব।

দিল্লিতে ডাক্তারী পড়তে এসে এই ধরনের ডায়েরী লেখার দরকার হয়নি।।

ছোটবেলা থেকে ব্যক্তিগত ডায়েরী লেখার অভ্যাস খুব কম মানুষের থাকে; তবে বড় হবার পর অনেকেই ডায়েরী লেখেন। তার কারণ বড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মন ডানা মেলে উড়তে শুরু করে। কত কি স্বপ্ন দেখে, কত নতুন নতুন ভাবনা-চিন্তা ভাব-ভালবাসা সুখ-দুঃখের টুকরো টুকরো মেঘ মনের আকাশে আনাগোনা আসা-যাওয়া করে। জমতে থাকে ছোট্ট-ছোট্ট, টুকরো-টুকরো একান্ত ব্যক্তিগত কথা।

যে কথা, যে চিন্তা-ভাবনা-ভাব-ভালোবাসা-সুখ-দুঃখের কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করা না গেলেও প্রকাশ করতে মন চায়। সেইজন্যই ব্যক্তিগত ডায়েরীতে সেসব লিপিবদ্ধ করতে মন চায়, ইচ্ছে করে। কোন গোপন কথাই মানুষ চিরদিন নিজের মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারে না। অসম্ভব।

যাইহোক আমি যৌবনে পদার্পণ করার পরও আমার মনে তেমন কোন আবেগ বা ভাব-ভালবাসা সুখ-দুঃখের চোরা মেঘ আনাগোনা করেনি। আমার সব ব্যাপারই ছিল খোলামেলা। সব কিছুই ঘটতো প্রকাশ্যে, নানাজনের সামনে। তাছাড়া আমার জীবনের সব চাইতে কাছের, সব চাইতে প্রিয়, সব চাইতে কাম্য যে দুটি নারী, তাঁরা তো মহীয়সী মা-বড়মা। এরাই আমার খেলার সাথী, এরাই, আমার সব চিন্তা ভাবনার অংশীদার। এদের স্পর্শে গন্ধে সান্নিধ্যে আমি আনন্দের মানস সরোবরে ভেসে বেড়াই।

এই দু'টি নারীর সঙ্গে আমার একান্ত ঘনিষ্ঠতা, একাত্মতার ব্যাপার কে না জানে?

যে ডায়েরীতে একান্ত নিজস্ব বা গোপন কথা লেখা হয়, সেখানে মা-বড়মাকে টেনে আনা যাবে না।

দিল্লীতে ডাক্তারী পড়তে এসে আলাপ-পরিচয় হলো বহু মেয়ের সঙ্গে। এরা সবাই আমার ব্যাচের ছাত্রী না কিছু মেয়ে আবার দু'এক বছরের সিনিয়র, কিছু মেয়ে আমার পরবর্তী ব্যাচের। তাহোক। এদের অনেকের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা, হৃদ্যতা ও বন্ধুত্ব। কত হাসি-ঠাট্টা হয় ওদের সঙ্গে।

আজ ডায়েরী লিখতে বসে কত কথা মনে পড়ছে।...

একেবারে প্রথম দিনের কথা। প্রথম সাত-দশ দিনের মধ্যেই অধ্যাপক

ডাক্তাররা আমাদের মগজ ধোলাই করে মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন, অ্যানাটমি আর ফিজিওলজি যে যত ভাল জানবে, সে তত ভাল ডাক্তার হবে।

ডাক্তারী যখন পড়তে এসেছি, তখন অবশ্যই ভাল ডাক্তার হতে হবে। তবে সব ছাত্র-ছাত্রীরাই এই ব্যাপারে এক মত কিন্তু...

হ্যাঁ, সত্যিই বেশ বড় একটা কিন্তু আছে। অ্যানাটমি ভাল করে জানতে হলে প্রতিদিন দু'চার ঘণ্টা একাগ্র চিত্তে ডিসেক্‌শান করতে হবেই।

ডিসেক্‌শান?

মানে পচা মড়া কাটা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মড়া কাটা। শুনেই অনেক চমকে উঠল কিন্তু পিছিয়ে যাওয়া তো চলবে না।

কিছু ছেলে-মেয়ে জামাকাপড়ে প্রচুর সেন্ট দিয়ে ডিসেক্‌শান হল-এ পা দিয়েই নাকে রুমাল দিতে বাধ্য হলো।

সত্যি ডিসেক্‌শান হল-এর গন্ধ সহ্য করা প্রায় দুঃসাধ্য। হল-এর মধ্যে পঁচিশ-তিরিশ থেকে পঞ্চাশ-ষাটটা ডেডবডি পড়ে থাকে। কোন ডেডবডিই অক্ষত না। ছাত্র-ছাত্রীদের কাটাকুটির কৃপায় এক একটা মৃত দেহের একেক রকম অবস্থা। দেখেই শিউরে উঠতে হয়। তাছাড়া সারা ঘরে অসহ্য বিকট দুর্গন্ধ। সহ্য করতে না পেরে অনেকেই বমি করে। অনেকেই কিছু খেতে পারে না দীর্ঘ দিন।

তবে পচা ভাদ্দরের মেঘও একদিন কেটে যায়। নীল আকাশে টুকরো টুকরো সাদা মেঘ মনের আনন্দে নেচে বেড়ায়। সূর্যের আলোয় ঝলমল করে পৃথিবী। ঠিক সেই রকম মেডিক্যাল ছাত্র-ছাত্রীদেরও ডিসেকশন করার আতঙ্ক ভয় যন্ত্রণা আস্তে আস্তে চলে যায়।

হঠাৎ সেদিন আমার ডিসেকশন টেবিলের পাশে এসেই বিপাশা ত্রিপাঠী এক গাল হেসে বলে, শুভ, চলো, চলো, অনেক হয়েছে।

যাস্ট এ মিনিট।

এক মিনিট তো দূরের কথা, দশ-পনের মিনিট পরেও আমি নড়তে পারি না।

বিপাশা গলা চড়িয়ে বলে, সবাই কখন চলে গিয়েছে জানো?

এবার আমি মুখ তুলে দৃষ্টি ঘুরিয়েই বলি, সবাই কখন গেলো? আমি তো টেরও পাইনি।

যাইহোক ডিসেকশান বক্স গুছিয়ে হাত ধুয়ে বিপাশার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে আসি।

মাস খানেকের মধ্যে অন্তত পাঁচ-ছ' দিন সবাই চলে যাবার পর আমি আর বিপাশা ডিসেকশান রুম থেকে বেরোই।

সেদিন ডিসেকশান হল থেকে বেরুতেই আমাদের ব্যাচের আট দশজন ছেলে

মেয়ে আমাদের ঘিরে ধরলো। সবার মুখেই অর্থপূর্ণ হাসি সবার চোখেই কৌতুক-দৃষ্টি।

বাসুদেব কুলকার্নি হাসতে হাসতে বলে, তোদের তান্ত্রিক সাধনা কেমন হলো?

বিপাশা চাপা হাসি হেসে ডান হাত দিয়ে ওর গাল টিপে বলল, বাসুদেব, রিয়েলী ইট ওয়াজ ওয়ান্ডারফুল।

ও এক নিঃশ্বাসেই বলে, আর ইউ হ্যাপি?

আই উইল বী হ্যাপি যদি আমাদের খাইয়ে দাও।

ওর মুখের কথা ফুরুতে না ফুরুতেই বিপাশা ওর গালে একটা চড় মেরে বলে, আরো খাবি?

বাসুদেবও সঙ্গে সঙ্গে ওকে চড় মারতে যায় কিন্তু বিপাশা ঝড়ের বেগে সরে যায়।

সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।

কিছুদিন আমাকে আর বিপাশাকে নিয়ে দু'চারজন কিছুদিন হাসি-ঠাট্টা করলেও আস্তে আস্তে সবাই বুঝেছিল, আমরা নিছকই বন্ধু। এই বন্ধুত্ব দিন দিন আরো গভীর, আরো মধুর হয়েছে। দিল্লীতে যাবার পর বিপাশাই আমার হাতে প্রথম রাখী পরায়।

তখন আমরা থার্ড ইয়ারে উঠেছি। কফি খেতে খেতে আমি বিপাশাকে বলি, তুমি কী হতে চাও? গাইনি? পিডিয়াটিশিয়ান, জেনারেল প্রাকটিশানার...

ও একটু হেসে বলে, ব্যস! ব্যস! আর এগিয়ো না।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বিপাশা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, শুভ, অন্য কাউকে বলিনি, বলতে পারবও না কিন্তু তোমাকে বলতে দ্বিধা নেই যে আমার বাবা অতি সাধারণ সরকারী চাকুরে।

আমি জিজ্ঞাস দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাতেই ও একটু ম্লান হেসে বলে, হি ইজ যাস্ট অ্যা আপার ডিভিশন ক্লার্ক।...

তোমার বাবা কোথায় কাজ করেন?

বেনারসের জেলা জজের অফিসে।

বিপাশা একটু থেমে বলে, আমরা তিন বোন ; কোন ভাই নেই। তাছাড়া আমার মা-র কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট হয়েছে।...

আই সী।

বাবার আর্থিক অবস্থা বেশ খারাপ। সংসার চালানো ছাড়াও মা-র জন্য প্রতি মাসে যথেষ্ট খরচ করতে হয়। লাখ লাখ টাকা খরচ করে মেয়েদের বিয়ে দেবার ক্ষমতা নেই বলেই বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন।

তুমি কি এম. বি. বি. এস. পাশ করেই চাকরি করবে নাকি...

চাকরি করতেই হবে।

বিপাশা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, বাবাকে সাহায্য করতে না পারা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। তাছাড়া মা-র চিকিৎসা আর ছোট বোনদের দায়িত্ব তো আমাকেই নিতে হবে।

দিন দিন বিপাশার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। কখনো কখনো ও আমার কথা জানতে চায়, জানতে চায় বাবার মৃত্যুর কথা, মা-বড়মার কথা, জ্যেঠু আর ভাইদার কথা।

এইসব সোনার পর বিপাশাও কত কথা বলে।

শুভ, তোমার বাবার মৃত্যুর কথা যখনই মনে হয়, তখনই মন খারাপ হয়ে যায়। তুমি তোমার বাবাকে এক মুহূর্তের জন্যও দেখতে পাওনি ভাবলেই আমার চোখে জল আসে। নিঃসন্দেহে তোমার জীবনের অর্ধেক অন্ধকার।

আমি কোন কথা বলি না ; চুপ করে থাকি।

বিপাশা আমার একটা হাত ওর দুটো হাতের মধ্যে নিয়ে দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর বলে, আবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়, একদিক দিয়ে তোমার মা আর তোমার মত ভাগ্যবান খুব বেশি দেখা যায় না।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, অমন জ্যেঠু, বড়মা আর ভাইদা পাওয়া সত্যি অভাবনীয় সৌভাগ্যের ব্যাপার।

আমি একটু হেসে বলি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বিপাশা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তাছাড়া অমন দাদা, বন্ধুও বোন আর বাবাইসোনা পেয়েছিলেন বলেই তোমার মা স্বামীকে হারাবার দুঃখ সহ্য করতে পেরেছেন।

হ্যাঁ, বিপাশা তুমি ঠিকই বলেছ।

সময় ও সুযোগ হলে আমরা আরো কত কথা বলি।

একদিন একটা ক্লাশ শেষ হতেই বিপাশা ইসারায় আমাকে ডাক দেয়। তারপর করিডরের এক কোনায় গিয়ে বলে, শুভ, তোমাকে একটা কথা বলব ; কিছু মনে করবে না তো?

কি আবার মনে করব? বলো, বলো, কি বলতে চাও।

কাল রাত্তিরে বাবা হস্টেলে ফোন করেছিলেন।

ফোন করেছিলেন কেন?

বাবা বললেন, এখুনি টাকা পাঠাতে পারছেন না কিছুদিন দেরি হবে।

ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, এদিকে পরশুর মধ্যেই হস্টেলে টাকা দিতে হবে। তুমি কি আমাকে...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আমি একটু হেসে বলি, বিপাশা, ভুলে যেও না, তুমি আমার হাতে রাখী পরাও ইউ আর মাই সিস্টার।

আমি না থেমেই বলি, তুমি কোন চিন্তা করো না। আমি আজই ব্যাঙ্ক থেকে

টাকা তুলে রাখবো। তুমি কাল হস্টেলে টাকা দিয়ে দিও।

তোমার কোন অসুবিধে হবে না তো?

না, না, কোন অসুবিধে হবে না।

আমি সঙ্গে সঙ্গেই আবার একটু হেসে বলি, আমি জন্মাবার পর পরই মা আমার হায়ার এডুকেশনের জন্য যে ইন্সিওর করেন ; তার পুরো টাকাই আমার ব্যাঙ্কে আছে। তাছাড়া মা আর জ্যেঠু প্রত্যেক মাসেই বেশ কিছু টাকা ব্যাঙ্কে জমা করেন।

বিপাশা একটু হেসে বলে, তার মানে তুমি বেশ মোটা টাকার মালিক।

দ্যাটস্ রাইট।

আমি এক নিঃশ্বাসেই বলি, সেইজন্যেই তো বললাম তোমার কোন চিন্তা নেই।

তোমার কথা শুনে খুব নিশ্চিন্ত হলাম। বাবা টাকা পাঠালেই আমি তোমাকে দিয়ে দেব।

হ্যাঁ, টাকা ফেরত দিও কিন্তু আর কোনদিন আমার হাতে রাখী পরাতে পারবে না।

কি আশ্চর্য!

কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার না। রাখী পরাবে আবার ধার-দেনার সম্পর্ক গড়ে তুলবে, তা হয় না।

বিপাশা মুগ্ধ বিস্ময়ে আমার দিকে তাকায়। কোন কথা বলে না।

জীবনে কখনও তুমি আমার সঙ্গে হিসেব-নিকেশ করবে না ; আমিও করব না। তুমি সারাজীবন আমার পাশে থাকবে, আমিও সারাজীবন তোমার পাশে থাকব।

হ্যাঁ, শুভ, তাই হবে।

মা-বড়মা ছাড়া যে নারীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে সে বিপাশা। ওকে দেখতে সত্যি ভাল। তাছাড়া ওর চোখে মুখে স্নিগ্ধ লাবণ্যে ভরা। এই ভরা যৌবনেও ওর চোখে-মুখে-শরীরের কোথাও যৌবনোচিত ঔদ্ধত্য নেই। দিল্লিতে এম. বি. বি. এস. পড়ার সময় ওর সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি কিন্তু কোনদিন কোন মাদকতার ভাব আসেনি আমার মনে। কোন বিনিদ্র রজনীও যাপন করিনি ওর চিন্তায়।

কোন দিন এক মুহূর্তের জন্যও বিপাশাকে নিয়ে ভবিষ্যতে জীবন কাটাবারও স্বপ্ন দেখিনি। আমার সঙ্গে এত ভাব-ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও ওর মধ্যেও কোনদিন কোন দুর্বলতা দেখিনি।

সেই সেবার ওকে টাকা দেবার সপ্তাহ খানেক পরই বিপাশা একটা খাম আমার হাতে দিয়ে একটু হেসে বলল, বাবা তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন।

চিঠি হাতে নিয়েই পড়ি।...

স্নেহের শুভব্রত, আমার মেয়ে বিপাশা দীর্ঘ চিঠি লিখে সবকিছু জানিয়েছে। কৃতজ্ঞতায় না, তোমার জন্য গর্বে আর আনন্দে বুক ভরে গেছে। মেয়ের চিঠিতে তোমার কথা জেনে আমার স্ত্রী যে কি খুশি হয়েছে, তা প্রকাশ করার ভাষা আমার জানা নেই। আমার অন্য দুই মেয়ে—গঙ্গা আর কাবেরীও এই চিঠি পড়েই ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করেছে। ওরা দিনরাত বলছে, ভাইয়া পেয়েছে।

অফিসে বসে চিঠি লিখছি। দীর্ঘ চিঠি লেখার সময় সেই। তবে একটা কথা না জানিয়ে পারছি না। দশেরা দেওয়ালীর ছুটিতে বিপাশা আমাদের কাছে আসবে। ঐ সময় তুমিও নিশ্চয় কলকাতায় যাবে। আমাদের সবার একান্ত ইচ্ছা আর অনুরোধ কলকাতা যাতায়াতের পথে তুমি আমাদের সঙ্গে কয়েকটি দিন কাটাও। তোমাকে একটু বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য আমি আর আমার স্ত্রী বড়ই ব্যগ্র। তুমি নিশ্চয়ই এসো। আমরা সবাই খুব খুশি হবো, খুব আনন্দ পাবো। আশা করি তোমারও ভাল লাগবে।

প্রাণভরা আশীর্বাদ নিও।

—বিশ্বনাথ ত্রিবেদী

খুব ভাল লাগলো চিঠিটা পড়ে। আমি সঙ্গে সঙ্গেই বিপাশাকে বললাম, তুমি লিখে দিও আমি তোমার সঙ্গেই কাশী যাবো; তারপর ওখান থেকে কলকাতা যাবো।

সেবায় পুজোর ছুটিতে কলকাতা যাবার পথে বিপাশাদের সঙ্গে ক'দিন কাটাবার স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলব না।

ভোরবেলায় ডিলুক্স এক্সপ্রেস বেনারস ক্যান্ট স্টেশনে পৌঁছবার পর প্ল্যাটফর্মে নামতে না নামতেই ছুটে এলেন বিপাশার বাবা আর গঙ্গা-কাবেরী। আমি বিপাশার বাবাকে প্রণাম করতেই উনি দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি জানতাম, তুমি আসবেই। তুমি এসেছ বলে খুব খুশি হয়েছি।

বিপাশার এক বোন আমাকে প্রণাম করেই এক গাল হেসে বলল, ভাইয়া, আমি গঙ্গা।

অন্য বোন প্রণাম করে বলল, ভাইয়া, আমি কাবেরী।

টাঙায় সামনের দিকে গঙ্গা আর কাবেরী আমাকে মাঝখানে নিয়ে বসলো; পিছনে বিপাশা আর ওর বাবা।

গঙ্গা আর কাবেরী আমার দুটো হাত ধরে কত কথা বলে। গঙ্গা বলে, জানো ভাইয়া, তোমার চিঠি পাবার পর থেকেই আমরা ক্যালেন্ডারে দাগ দিতে শুরু করি ; আর মাকে বলি, মা ভাইয়া আর কত দিন পর আমাদের কাছে আসবে।

মা কি বলেন?

বলেন, আমিও তো দিন গুনছি ওর আসার জন্য।

কাবেরী এক হাত দিয়ে আমার মুখখানা ওর দিকে ঘুরিয়েই হাসতে হাসতে

বলে, ভাইয়া, আজ তুমি ঘুমুতে পারবে না। আমরা সারারাত গল্প করব।

সারারাত গল্প করবে?

এত কথা জমে আছে যে সারারাত তো জাগতেই হবে।

জঙ্গম বাড়ির একটা গলির মুখে টাঙা থেকে নেমেই বিপাশার বাবা আমাকে সামনের একটা পুরনো একতলার বাড়ি দেখিয়ে বলেন, শুভব্রত, এই বাড়িরই পিছন দিকে আমরা থাকি।

দরজা দিয়ে ঢুকেই এক চিলতে উঠোন। তারই একপাশে বাথরুম-পায়খানা। উঠোনের পরই চার-পাঁচ ফুট চওড়া বারান্দা ; ঐ বারান্দার এক পাশে রান্নাবান্না হয়। দু'টি মাঝারি সাইজের ঘর। দু'টি ঘরেই দু'টি করে তক্তাপোষ। একটা ঘরের একদিকে একটা বেঞ্চির উপর বইপত্তর দেখেই বুঝলাম, এই ঘরেই গঙ্গা আর কাবেরী থাকে।

গঙ্গা বলল, ভাইয়া, তুমি আমাদের ঘরেই থাকবে।

আমি শুধু হাসি।

ঠিক সেই সময় গঙ্গাস্নান করে বাবা বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢেলে বাড়ি ফিরলেন বিপাশার মা আরতি দেবী। পরনে অত্যন্ত সাধারণ সাদা খোলের শাড়ি। এক হাতে ভেজা শাড়ি-ব্লাউজ, অন্যহাতে তামার ঘটি। বুঝলাম, ওতেই গঙ্গাজল নিয়ে বাবার মাথায় ঢেলেছেন ; বোধহয় একটু গঙ্গা জল নিয়েও এসেছেন। মাথায় এক রাশ চুল ; তখনও জল ঝরছে। মুখে স্নিগ্ধ প্রশান্ত হাসি। সব মিলিয়ে এক কল্যাণী মাতৃ মূর্তি। এক ঝলক দেখেই শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মাথা নুয়ে আসে।

ওনাকে দেখেই কাবেরী দু'হাতে তালি দিয়ে তারস্বরে চিৎকার করে, ভাইয়া এসে গেছে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে ওনাকে প্রণাম করি। উনি হাতের কাপড় আর তামার ঘটি নামিয়ে রেখে দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা ধরে কপালে স্নেহচুম্বন দেবার পর এক গাল হেসে বলেন, আমি আজকাল বুক ফুলিয়ে সবাইকে বলি, আমার ছেলেও দিল্লীতে ডাক্তারী পড়ছে।

শুনে আমার মন ভরে যায়। আমিও এক গাল হেসে বলি, নিশ্চয়ই আমি আপনার ছেলে।

আরতি দেবী দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা ধরে অপলক দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে বলেন, একটা ছেলে ছিল না বলে মনে বড় দুঃখ ছিল। তোমাকে পেয়ে আমার সব দুঃখ চলে গেছে।

আমিও একটু হেসে বলি, আমাকে না দেখেই এত ভালবেসে ফেলেছেন!

কি করব বাবা!

উনি একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলেন, এই যে বাবা বিশ্বনাথের মাথায় প্রতিদিন জল ঢেলে আসি কিন্তু তাঁকে তো দেখার সৌভাগ্য হয়নি। শুধু তাঁর কথা জেনেই

তাঁকে ভক্তি করি, পুজো করি।

আরতি দেবী সঙ্গে সঙ্গেই একটু হেসে বলেন, তাহলে তোমার কথা জানার পর তোমাকে কেন ছেলে মনে করবো না?

গঙ্গা দু'হাতে দু'কাপ চা নিয়ে আমাদের পাশে এসে বলে, ও মা, পরে ছেলেকে আদর করো এখন ভাইয়াকে চা খেতে দাও।

এইভাবেই হলো শুরু।

সাড়ে ন'টার আগেই বিপাশার বাবা অফিসে রওনা হলেন। বেরুবার আগে উনি আমাকে বললেন, আফিস থেকে ফিরে আসার পর তোমার সঙ্গে গল্প করবো।

তারপর আমাদের পাঁচজনের কত কথা কত গল্প। চা খেতে খেতে গল্প, রান্না করার সময় গল্প, দুপুরে সবাই মিলে বারান্দায় খেতে বসেও গল্প।

না, তাতেও যেন কথা ফুরোয় না। সারা দুপুর কত কথা, কত হাসি।

সকালে জলখাবার খেতে খেতেই আমি আরতি দেবীকে বললাম, আপনি তো জানেন, আমার মা আছেন, বড়মা আছেন।

উনি একটু হেসে বলেন, হ্যাঁ, বিপাশা সব জানিয়েছে।

তাই আমি আপনাকে ছোট মা বলব। আপনার আপত্তি নেই তো?

না, বাবা, কোন আপত্তি নেই।

বিপাশা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, শুভ, তোমাকে কি গঙ্গার হায়ার সেকেন্ডারীর রেজাল্টের ডিটেলস্ বলেছি?

তুমি শুধু বলেছিলে, ও ফার্স্ট ডিভিসন পাশ করেছে।

তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে গঙ্গা শুধু ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করেনি, ও ও ফিজিক্স-কেমিস্ট্রী আর ম্যাথস্-এ হাইয়েস্ট নম্বর পেয়েছে।

আমি কোন মন্তব্য করার আগেই কাবেরী গলা চড়িয়ে বলে, ভাইয়া, মেজদি সমস্ত ইউ-পি'র মধ্যে এই রেকর্ড করেছে।

গঙ্গা আমার আমার বাঁ দিকেই বসেছিল। আমি বাঁ হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে একটু কাছে টেনে নিয়ে বলি, সারাজীবন তোমাকে এইভাবে জয়ী হয়ে মা-বাবার মুখে হাসি ফোটাতে হবে।

ও মুহূর্তের জন্য আমার দিকে তাকিয়েই মুখ নীচু করে বলে, আমরা তিন বোনেই সব সময় সেই চেষ্টা করি।

তা আমি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছি।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মেয়েদের ঘরেই আমাদের আড্ডার আসর বসলো। একটা তক্তাপোষে বিপাশা আর ওর মা, অন্য তক্তাপোষে আমি আর অন্য দুই মেয়ে।

বিকেলের দিকে বিপাশা আমাকে বলে, শুভ, তুমি কি এখানকার গঙ্গায় নৌকা চড়েছে?

না।

তাহলে তুমি গঙ্গা আর কাবেরীকে নিয়ে নৌকা চড়ে এসো খুব ভাল লাগবে।

আমিও ভাবছিলাম, একটু ঘুরে আসি।

চা খেয়েই আমরা তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম। সত্যি, নৌকায় চড়ে ঘাটগুলি দেখতে দেখতে কত কি মনে হলো। মনে হলো, যুগ-যুগান্তর ধরে ভারতবর্ষের মানুষ দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা সাফল্য-ব্যর্থতা ভুলে আত্মার মুক্তি সাধনায় নিজেদের মগ্ন রাখতে জানে। এটাই ভারতবর্ষের চিরন্তন রূপ। গঙ্গার বুকে নৌকায় বসে বসে অসংখ্য মন্দিরের সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ শুনলাম। তারপর শেষ হয় আমাদের নৌকা বিহার।

বাড়ি ফেরার পথে গঙ্গা আর কাবেরী দু'জনেই বলল, ভাইয়া, এখনই বলে দিচ্ছি, রাত্রে তোমাকে একলা শুতে দেব না। আমরা দু'জনে দু'পাশে শোব।

আমি একটু হেসে বলি, একটা খাটে কি তিনজনে শুতে পারবো?

ওরা দু'জনে একসঙ্গে বলে, দুটো খাট জোড়া দেব।

বাড়ি ফিরেই কাবেরী সগর্বে ঘোষণা করে, রাত্রে আমরা দু'জনে ভাইয়ার দু'পাশে শোবো।

বিপাশা একটু হেসে বলে, আমি কোথায় শোবো?

গঙ্গা সঙ্গে সঙ্গে জবার দেয়, তুমি মা-র কাছে শোবে।

ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে বিশ্বনাথবাবু এক গাল হেসে বলেন, দেখছো শুভব্রত, তোমাকে পেয়ে তোমার বোনেরা কি দারুণ একসাইটেড?

ওদের কাছে পেয়ে আমিও খুব একসাইটেড।

মুহূর্তের জন্য থেমে বলি, আমি তো জীবনে কোনদিন এই আনন্দ পাইনি, তাই খুব ভাল লাগছে।

বিপাশা দুটো আসন পেতে বলে, তোমরা বসে কথা বলো।

হ্যাঁ, আমরা দু'জনে মুখোমুখি বসতেই বিশ্বনাথবাবু বলেন, সারাদিন কেমন কাটালে?

খুব ভাল।

খুব ভাল কেন?

আমি একটু হেসে বলি, এমন আন্তরিকতা আর প্রাণ ঢালা ভালবাসা পেয়েও ভাল থাকব না?

হ্যাঁ, শুভব্রত, আমাদের সংসারে আন্তরিকতা আর ভালবাসার কোন অভাব নেই।

মনের দুর্বলতা থেকেই তো অভাব বোধের জন্ম।

তুমি ঠিকই বলেছ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লোভ থেকেও অভাববোধ জন্মায়।

আপনি ঠিকই বলেছেন; যে লোভী, তাকে কোনভাবেই খুশি করা যায় না।

আরো কত কথা হয় আমাদের। মাঝে মাঝেই যোগ দেন আরতি দেবী। আলোচনা চলল খাবার সময় পর্যন্ত।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার সময় বিপাশা অন্য দুই বোনকে বলে, তোরা দু'জনে শুভ'র সঙ্গে জমিয়ে গল্প করবি আর আমি বুঝি ভাল মেয়ে হয়ে মা-র কাছে শুয়ে থাকব?

কাবেরী চাপা হাসি হেসে বলে, দিদি, তুই বরং আমাদের সঙ্গে ঘণ্টা খানেক গল্পগুজব করে শুতে যাস।

ইস্! তুই কী উদার!

বিপাশা বলে, আমিও তোদের ঘরেই শোবো।

শেষ পর্যন্ত আমরা চারজনেই ঐ ঘরে শুই। তবে গঙ্গা আর কাবেরীকে দু'পাশে নিয়ে শুতে খুবই অস্বস্তিবোধ করি। গঙ্গা কুড়ি বছরের যুবতী ; কাবেরীও নেহাত ছোট না। ওর বয়স সতের। আমি ওদের দু'জনের মাঝখানে প্রায় কাঠের মতো শুয়ে থাকি।

ওরা দু'জনে আমার অবস্থা না বুঝলেও বিপাশা ঠিকই বুঝতে পারে। ও একটু হেসে বলে, শুভ, গঙ্গা আর কাবেরী তোমার চাইতে অনেক ছোট। তোমার অস্বস্তিবোধ করার কোন কারণ নেই।

কাবেরী সঙ্গে সঙ্গে এক হাত দিয়ে আমার মুখখানা ওর দিকে ঘুরিয়ে বলে, ভাইয়া, আমি আর মেজদি তোমার পাশে শুয়েছি বলে তোমার খারাপ লাগছে?

না, না খারাপ লাগছে না।

গঙ্গা বলে, ভাইয়া, তুমি প্লীজ স্বাভাবিক হয়ে শোও। তা না হলে আমার খারাপ লাগছে।

আমি দুটো হাত ওদের মাথায় রেখে বলি, আমার তো কোন ছোট বোন নেই ; তাই অভ্যাস নেই। তবে আজ তোমাদের দু'জনকে দু'পাশে পেয়ে আমার সত্যি খুব ভাল লাগছে।

এর পর আমি সত্যি একটু স্বাভাবিক হয়ে শুই কিন্তু সতর্ক না হয়ে পারি না।

যাই হোক আস্তে আস্তে জমে ওঠে আমাদের গল্পগুজব। কি ভাবে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, তা আমরা কেউই টের পাই না। হঠাৎ একবার টর্চ জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখেই বিপাশা হাসতে হাসতে বলে, শুভ, আড়াইটে বাজে।

গঙ্গা সঙ্গে সঙ্গে বলে, বাজুক ভাইদার ঘুম পায়নি।

তাই নাকি?

ইয়েস মাই ডিয়ার দিদি! ভাইদার সত্যি ঘুম পায়নি।

তোরা কি ওকে সারা রাত্তির ঘুমোতে দিবি না?

আমি বলি, বিপাশা, তুমি ঘুমোও। আমি আর একটু ওদের সঙ্গে কথাবার্তা

বলেই ঘুমোব।

শুভ, আমি ঘুমোচ্ছি। বড্ড ঘুম পাচ্ছে। তুমি কিছু মনে করো না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি ঘুমোও। আমি কিছু মনে করবো না।

বিপাশা বোধহয় চোখ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ে, মিনিট দশেকের মধ্যে কাবেরীও ঘুমিয়ে পড়ে। ওদের দু'জন ঘুমিয়ে পড়ায় গঙ্গা মহা খুশি। এক গাল হেসে বলে, ভাইয়া, এবার তুমি আমার দিকে পাশ ফিরে শোও।

হ্যাঁ, আমি ওর দিকে পাশ ফিরে শুয়েই বলি, তোমার ঘুম পাচ্ছে না?

না।

কেন?

তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ, আমাদের মধ্যে দৈন্যও নেই, দুঃখও নেই ; আমরা পাঁচজনেই খুব সুখী কিন্তু আমাদের কোন ভাই নেই বলে আমরা সবাই এত বছর ধরে একটা বিচিত্র শূন্যতাবোধ করেছি।

তা তো খুবই স্বাভাবিক।

আজ মা ছেলে পেয়েছে, আমরা ভাইয়া পেয়েছি। এমন আনন্দের দিনে কি ঘুম আসে?

আমি আলতো করে ওর মুখের উপর হাত রেখে বলি, গঙ্গা, আমিও এত বছর ধরে যে শূন্যতা, যে অভাববোধ করেছি, তা তোমাদের পেয়ে চলে গেল।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, আজ আমারও পরম আনন্দের দিন।

গঙ্গাও আমার মুখের উপর একটা হাত রেখে বলে, মা কি বলছিলেন জানো?

কি বলছিলেন?

বলছিলেন, শুভব্রতর মত ছেলে পেয়ে আমার বল-ভরসা হাজার গুণ বেড়ে গেল। এখন যে সমস্যাই আসুক, আমার ছেলেই সব সামলে নেবে।

হ্যাঁ, গঙ্গা, আমি সারাজীবন তোমাদের পাশে থাকব। সে বিশ্বাস, সে আস্থা আমাদের আছে।

আমার ডায়েরীর পাতায় ওরা বার বার ফিরে এসেছে। ফাইন্যাল এম. বি. বি. এস. পরীক্ষার পর ওদের তিন বোনকে নিয়ে কলকাতা যাবার কাহিনী, ওদের তিনজনকে কাছে পেয়ে মা-বড়মা আর জ্যেঠু-ভাইদার আনন্দে খুশিতে মেতে ওঠার কথা, ওদের তিনজনের পাল্লায় পড়ে ওদের সঙ্গেই মা-বড়মার কাশী যাওয়ার বৃত্তান্তে ভরে গেছে পাতার পর পাতা।

বিপাশাদের পরিবারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা অভাবনীয় না হলেও অপ্রত্যাশিত, না। পৃথিবীতে অনেকেই অপ্রত্যাশিত ভাবে পেয়ে যায় আপনজনের সান্নিধ্য, স্নেহ-মমতা-ভালবাসা। কিন্তু আজ যা লিখতে বসেছি, তা যেমন অপ্রত্যাশিত, সেইরকমই অভাবনীয়। আমি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি, এমন একজনের সাক্ষাৎ

ও সান্নিধ্য পাবো ; আমি ভাবতে পারিনি, আমার এত বছরের সযত্নে লালিত পালিত চিন্তা-ভাবনা-আদর্শ-দৃষ্টিভঙ্গী কয়েকটি অবিস্মরণীয় মুহূর্তের মধ্যে বদলে যাবে।

ফাইন্যাল এম. এস. পরীক্ষার পর কলকাতা গেলাম আমার প্রিয়তম চারটি মানুষের সান্নিধ্যে আনন্দে কয়েকটি দিন কাটাবার জন্য। আমি যত উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে গিয়েছিলাম, বড়মার কাছে ভাইদার বিয়ের খবর শুনে আমি ঠিক তত দুঃখ ও আঘাত পেলাম। ভীষণ রাগও হলো। কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল, আমি তখনই আবার এয়ারপোর্টে ফিরে যাই পরবর্তী ফ্লাইটে দিল্লীতে আসার জন্য। না, তা পারলাম না। মা-বড়মা-জ্যেঠু-ভাইদাকে কোন রকম দুঃখ বা আঘাত দেবার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। পারলাম না। বড়মা-জ্যেঠুকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদেছি কিন্তু ওদেরই বুকের উপর মুখ রেখে সব দুঃখ ভুলেছি।

এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল কিন্তু যে মুহূর্তে ভাইদার স্ত্রীর রূপ-গুণের কথা শুনলাম, আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারি না। আমি দপ করে জ্বলে উঠি। আমি চিৎকার করে বড়মাকে বলি, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সী হার ফেস!

তারপর?

ভাইদার স্ত্রী আমার ঘরে ঢুকে আমার চোখের উপর চোখ রেখে বলল, তাতাই, আসামী হাজির। আমাকে কি শাস্তি দেবে দাও।

আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। মুহূর্তে মনে হলো, খাজুরাহোর সব চাইতে অপরূপ, সব চাইতে মোহময়ী, সব চাইতে উত্তেজক নারী মূর্তি হঠাৎ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

আর আমি?

ঠিক মর্মর মূর্তির মত আমি একই রকম অপলক দৃষ্টিতে রূপ-মুগ্ধ, মোহগ্রস্থ, কামনায় জর্জরিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

ও আরো কত কি বলে কিন্তু আমি শুনতে পাই না। শুনব কী করে? আমার অনেক ইন্দ্রিয়ই যে অবশ হয়ে গেছে। আমার শিরা-উপশিরার মধ্যে দিয়ে তখন অশান্ত দুর্বিনত এক পাগলা ঘোড়া ছুটছে।

দিল্লীতে ডাক্তারী পড়তে গিয়ে কত সুন্দরী যুবতীকে দেখলাম, তাদের অনেকের সঙ্গেই মেলামেশা করলাম কিন্তু কেউ আমাকে এভাবে পাগল করেনি।

সামনের মূর্তি দেখে আমার শরীরের প্রতি অণু পরমাণুতে দাউ দাউ করে কামনার আগুন জ্বলে ওঠে। এক একটি মুহূর্তে মনে হয় আমি বোধহয় আর নিজেকে সংযত রাখতে পারবো না ; মনে হয় কোন ন্যায়-অন্যায় বোধ আমার এই কামনার আগুন নেভাতে পারবে না।

না, না, আর সহ্য করা যায় না।

আমাকে ঝাঁপিয়ে পড়তেই হবে, এই খাজুরাহোর জীবন্ত রম্ভা উর্বশীর যৌবন-সুধা উপভোগ না করে আমি বাঁচতে পারবো না।

হঠাৎ মাথাটা ঘুরে ওঠে। নিজেই যেন নিজের গালে সজোরে থাপ্পড় মারি।

ছি! ছি! আমি কি ভাবছি? আমার প্রাণপ্রিয় ভাইদার স্ত্রীর সম্মান রাখতে জানি না?

না, না, এমন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না। অসম্ভব অকল্পনীয়। কিন্তু তবুও কি একটা মোহে আমি তখনো অপলক দৃষ্টিতে ওর দিতে তাকিয়ে থাকি।

হঠাৎ দুর্বা আমার সঙ্গে হ্যান্ডসেক করার জন্য হাত মেলাতেই মনে হলো হাজার হাজার ভল্টের বিদ্যুৎ প্রবাহ আমার সারা শরীরের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেল।

কী আছে এই মেয়েটির মধ্যে? গন্ধে স্পর্শে দর্শনে এই উন্মাদনা?

মনে মনে বলি, ঈশ্বর, কি উপাদান দিয়ে তুমি এই নারীকে সৃষ্টি করেছ?

এই সর্বনাশী আমার দু'গালে চুম্বন করতেই মনে হলো যেন সারা পৃথিবী টলমল করে উঠলো।

আবার এই ছলনাময়ী নারী আমার দু'হাত ধরে গেয়ে ওঠে—আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব...।

আচ্ছা, এইসব মিথ্যে কথা বলে আমার সর্বনাশ করার কি দরকার? তুমি আমাকে ভালবাসবে, সে কথাও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

আমি মনে মনে না হেসে পারি না। মুখে বলতে পারি না কিন্তু মনে মনে বলি, সেই সৃষ্টির আদিমততম কাল থেকে তোমরা তোমাদের রূপ-যৌবনের পসরা সাজিয়ে পুরুষকে প্রলুব্ধ করে চলেছ, ভালবাসার অভিনয় করে পুরুষদের এক অলীক আনন্দময় জগতে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও বিশ্বাসঘাতকতা করতে দ্বিধা করোনি। মূর্খ পুরুষ যুগ যুগ ধরে তোমাদের কামনা-বাসনার আগুনে ঝাঁপ দিয়ে নিজেরাই পুড়ে মরেছে। তোমরা পুরুষকে আনন্দও দাও না, শান্তিও দাও না। যে ঔদার্য মহত্ত্ব থাকলে নিজেকে অন্যের জন্য বিলিয়ে দেওয়া যায়, নিজেকে নিঃশেষ করে দেওয়া যায়, তা তোমাদের নেই। প্রেমের খেলায় পুরুষ চিরকাল ব্যর্থ, পরাজিত, সর্বশান্ত হয়েছে। আর তোমরা? সতী-সাধ্বীর ধ্বজা উড়িয়ে অন্য পুরুষকে দিয়ে নিজের কামনা বাসনার জ্বালা মিটিয়েছ।

দুর্বা! তুমিও তো এদেরই উত্তরসূরী, তাই না?

এক সপ্তাহ কলকাতায় কাটিয়ে দিল্লীতে ফিরেই প্রফেসর রাও-এর কাছে যাই। উনি যথারীতি এক গাল হেসে বলেন, ইয়েস মাই ডিয়ার বয়, কলকাতায় গিয়ে নিশ্চয়ই খুব আনন্দ করেছ?

হ্যাঁ, স্যার।

তোমার মা-বড়মা-জ্যেঠু-ভাইদাও নিশ্চয়ই তোমাকে কাছে পেয়ে খুব খুশি

হয়েছেন?

হ্যাঁ, স্যার।

গুড!

উনি মুহূর্তের জন্য থেমেই বলেন, শুভ, দেখো তো ফ্ল্যাস্কে কফি আছে কিনা। যদি কফি থাকে, তাহলে তুমি এক কাপ নাও, আমাকেও এক কাপ দাও।

প্রফেসর রাও কফির কাপে চুমুক দিয়েই বলেন, তোমাদের ব্যাচের অধিকাংশ ছেলেমেয়েই দিল্লী ছেড়ে চলে গেছে পরীক্ষার পরপরই। শুনছিলাম, দু'চারজন বিদেশ যাবার তোড়জোড় করছে। অন্যেরা নিশ্চয়ই মোটা মাইনের ভাল চাকরির চেষ্টা ব্যস্ত।

আমি চুপ করে ওনার কথা শুনি। কোন কথা বলি না।

শুভ, আমি চাই না, তুমি এখুনি কোন চাকরি নিয়ে এখান থেকে চলে যাও। আমি চাই তুমি কয়েক মাস আমার সঙ্গে কাজ করো।

শুনে আমি খুশি হই। বলি, হ্যাঁ স্যার, আমিও তাই চাই।

ইনস্টিটিউটের গভার্নিং বডি তোমাকে এখানেই চাকরি দিতে চায় কিন্তু যদি এখনই চাকরি করতে না চাও, তাহলে তোমাকে ফ্রী অ্যাকোমোডিশেন আর মাসে মাসে দশ হাজার টাকা অ্যালাউন্স দেবে।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আশা করি, তোমার কোন অসুবিধে হবে না।

আমি একটু হেসে বলি, স্যার, আমি অত টাকা দিয়ে কী করবো?

তুমি প্রতি মাসে মা-বড়মাকে তো কিছু পাঠাবেই। তাছাড়া যা পাবে, জমাবে। ভবিষ্যতে নিজে কিছু করলে জমানো টাকা খুবই কাজে লাগবে।

প্রফেসর রাও কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলেন, বোধহয় গভর্নমেন্টও তোমার জন্য কিছু করার কথা ভাবছে।

আমি হাসতে হাসতে বলি, স্যার, যা হচ্ছে বা ভবিষ্যতে হবে, সবই তো আপনার কৃপায়...

না, না, আমি কিছু করিনি তুমি নিজের গুণেই অনেক কিছু পাবে।

পরদিন থেকেই শুরু হলো আমার কর্মজীবনের প্রথম পাঠ।

সপ্তাহে তিন দিন আউটডোর, তিন দিন ইমার্জেন্সী তাছাড়া প্রতিদিনই অপারেশন। কোনদিন একটা, কোনদিন তিনটে। শুধু তাই না। সঙ্গে সঙ্গে চলে প্রফেসরের নির্দেশ মতো পড়াশুনা।

না, এখানেই আমার দৈনন্দিন কাজ বা কর্তব্য শেষ হয় না। প্রফেসর রাও নিজে যখন অপারেশন করেন, তখন আমাকে তার প্রধান সহকারীর কাজ করতে হয়।

অপারেশন থিয়েটারে অনেক নার্স কাজ করেন। অধিকাংশই মধ্যবয়সী ; তবে

পাঁচ-সাতজন নার্স যুবতী। ললিতা তেওয়ারী শুধু সর্বকনিষ্ঠা না, সব চাইতে মজাদার মেয়ে। সব সময় মুখে হাসি, ও যেন সব সময় প্রজাপতির মত উড়ে বেড়ায় ; হাজার কাজের চাপ থাকলেও ও হাসতে হাসতে সব সামলে নেয়। তাছাড়া টিকা-টিপ্পনী দেবার ওস্তাদ।

সেদিন প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে লিভারের একটা খুবই জটিল অপারেশনের পর আমরা তিন-চারজন ডাক্তার আর চার-পাঁচজন নার্স কফি খাচ্ছি। তার মধ্যে ললিতাও ছিল। কফি খেতে খেতেই আমরা টুকটাক কথা বলছিলাম। ঐ সব কথাবার্তার মধ্যেই হঠাৎ ললিতা মিসেস তলোয়ারকে বলে, তুমি জানো ব্যাচেলার শ্বশুরের ঘর-জামাই হবার জন্য ডক্টর ব্যানার্জী দিনরাত পরিশ্রম করছে?

মিসেস তলোয়ার জবাব দেবার আগেই আমি বলি, ললিতা, তুমি জানো না; প্রফেসর রাও ঠিক করেছেন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন?

ও চাপা হাসি হেসে বলে, তাই নাকি?

ইয়েস, ললিতা, ইয়েস!

আমি না থেমেই বলি, আমি প্রফেসরকে কি বলেছি জানো?

কী বলেছ?

বলেছি, স্যার, ললিতা যখন ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, তখনই ও পুরনো বন্ধুর সঙ্গে রেজেস্ট্রি করেছে।

ললিতা সঙ্গে সঙ্গে পাশের ট্রে থেকে একটা ছুরি তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে বলে, ডক্টর, আই উইল কিল ইউ।

মিসেস নায়ার বলেন, ললিতা, বেশি ন্যাকামো করিস না। তখন তোদের রেজেস্ট্রি না হলেও কিছুদিনের মধ্যেই তো...

ললিতা তাড়াতাড়ি ওর মুখ চেপে ধরে।

ললিতার ঠাট্টা-ইয়ার্কি বাদ দিলেও আমাকে নানাজনে বলে, প্রফেসর রাও তোকে গাধার মতো খাটাচ্ছেন।

তবে যে যাই বলুক, আমি বেশ বুঝতে পারছি, প্রফেসর রাও-এর কথামত কাজ করে আমার যথেষ্ট উপকার হচ্ছে। প্রত্যেক রুগীর সমস্যা আলাদা, প্রত্যেক অপারেশনও আলাদা। প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের রুগী দেখে আর অপারেশন করে আমার অভিজ্ঞতাও বাড়ছে। আস্থাও বাড়ছে। নিয়মিত বিভিন্ন জার্নাল পড়ে কত কি জানছি!

সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আমি যেন নেশার ঘোরে কাটাই। এক মুহূর্তের জন্যও নিজের কথা ভাবার অবকাশ পাইনা কিন্তু রাত্রে শোবার পরে?

ঐ খাজুরাহোর সর্বনাশী আমার সামনে হাজির হয়। মুখে চাপা হাসি, চোখে বিদ্যুতের ছটা। আমি অজানা মন্ত্রশক্তিতে সব শক্তি হারিয়ে ফেলি। শুধু মুগ্ধ

দৃষ্টিতে দেখি, ওর দেহের চড়াই-উতরাই, দেখি সর্বনাশা যৌবনের প্রলয়ঙ্কারী নাচ। আমি চিৎকার করতে পারি না কিন্তু সহ্য করতেও পারি না। বার বার মনে হয়, পাগলের মত চিৎকার করে সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দিই, আমি দুর্বাকে, আমার প্রেয়সীকে চাই। ওকে না পাবার দুঃখ কষ্ট জ্বালা আমি সহ্য করতে পারছি না।

সমাজ-সংসারের নিয়ম কানুন বিধি নিষেধ যাই থাকুক, মানুষের মন তো মুক্ত বিহঙ্গ। সে শরতের নীল আকাশে টুকরো টুকরো সাদা মেঘের মত স্বচ্ছন্দে মনের মহাকাশে বিচরণ করে।

শুক্লা ত্রয়োদশীর এই রাত্রে আমার শরীর যেন আরো একটা শরীর খোঁজে অনাস্বাদিত আনন্দ আর উষ্ণতার জন্য কিন্তু কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মানুষ যে রে।

এইভাবেই কেটে গেল প্রায় পাঁচ মাস।

সেদিন শনিবার। প্রফেসর রাও আমাকে বললেন, কাল সকালে একবার আমার ওখানে এসো।

হ্যাঁ, স্যার, আসব।

রবিবার সকাল ন'টা নাগাদ আমি প্রফেসরের কোয়ার্টারে গেলাম।

শুভ, প্লীজ সীট ডাউন।

আমি সামনের একটা চেয়ারে বসতেই উনি বললেন, আমি চাইনি তুমি যেখানে-সেখানে চাকরি করে মোটা মাইনে পাও। যাইহোক আমার এক প্রিয় ছাত্র মাথাই ব্যাঙ্গালোর অ্যাপোলোর সার্জারি ডিপার্টমেন্টের হেড। ও দিন দশেক আগে একটা জরুরী কাজে দিল্লী এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

আমি মন দিয়ে প্রফেসরের কথা শুনি।

প্রফেসর বলে যান, মাথাই-এর সঙ্গে তোমার বিষয়ে অনেক কথা হলো। তোমাকে সহকর্মী হিসেবে পেতে ও খুবই আগ্রহী। শুধু তাই না ; ও কথা দিয়েছে, তোমাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতেও দেবে।

আমি একটু হাসি।

উনি একটা খাম আমার হাতে দিয়ে বলেন, মাথাই ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলে তোমার এ্যাপয়েটমেন্ট লেটার পাঠিয়েছে। ওরা শুধু ভাল মাইনেই দেবে না ; তোমাকে ফার্নিসড্ কোয়ার্টর আর বিনা সুদে গাড়ি কেনার টাকাও দেবে। তাছাড়া গাড়ির খরচ বাবদ মাসে মাসে কয়েক হাজার টাকা দেবে।

স্যার, আমি কি এত পাবার যোগ্য?

অ্যাপোলো তো রামকৃষ্ণ মিশন না যে বিনা স্বার্থে মানুষের উপকার করবে?

ওনার মন্তব্য শুনে আমি না হেসে পারি না।

প্রফেসর একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলেন, দিন দশেক পরই তোমাকে জয়েন

করতে হবে; তবে জয়েন করার দু'একদিন আগে পৌঁছনোই ভাল।

হ্যাঁ, স্যার, তাই করবো।

কাল-পরশু কলকাতা যাও। সেখানে ক'দিন কাটিয়ে ব্যাঙ্গালোর যেও।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমেই বলেন,ঐ খামের মধ্যেই দিল্লী-কলকাতা-ব্যাঙ্গালোরের এয়ার টিকিটও ওরা পাঠিয়েছে।

আমি একটু জোরেই হেসে উঠে বলি, স্যার, আপনি আর কিছু ব্যবস্থা করেন নি?

আমি আবার কি ব্যবস্থা করবো?

কফি খাবার সময় প্রফেসর বলেন, বছরে অন্তত দু'বার আমার কাছে এসে কয়েকদিন কাটিয়ে যেও।

স্যার, আমি নিশ্চয়ই আসব।

আর হ্যাঁ, মাথাই বলছিল, তোমাদের ব্যাচের একজন মাস তিনেক আগে ওখানে জয়েন করেছে। ভালই হলো কি বলো?

হ্যাঁ, স্যার, আমাদের ব্যাচের কাউকে ওখানে পেলে আমার অনেক উপকার হবে।

আমি প্রণাম করতেই উনি বলেন, যাও, মন দিয়ে কাজ করো। কয়েক বছরের মধ্যেই তোমার খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বেই।

আমি আবার ওনাকে প্রণাম করে বিদায় নিই।

হঠাৎ দিল্লী ছেড়ে চলে যেতে হবে ভেবেই মন বিষণ্ণতায় ভরে গেল। দু'এক বছর না, দীর্ঘ সাত আট বছরের নিবিড় সম্পর্ক হস্টেলের এই ঘরের সঙ্গে তাছাড়া হস্টেলের প্রত্যেক কর্মীর সঙ্গেও আমার মধুর সম্পর্ক। বছরের পর বছর ওরা আমার দেখাশুনা না করলে কি পড়াশুনা করতে পারতাম? তাছাড়া ইনস্টিটিউটে কতজনের সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এদের সবার সঙ্গে দেখা না করে ইভনিং ফ্লাইটে বুকিং করেই ভাইদাকে অফিসে ফোন করে সব খবর জানালাম।

ভাইয়া, আমি সোজা অফিস থেকে এয়ারপোর্টে যাবো। তুই তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যাবি না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি এসো। প্লীজ দেখো, আমি আসছি তা যেন আগে থেকে কেউ না জানে।

না, না, আগে থেকে কাউকে বলব না।

মোড়ের মাথাতেই আমি ভাইদার গাড়ি থেকে নামলাম। ও যথারীতি বাড়ি গেল। আমি হাঁটি হাঁটি পা পা করে নিঃশব্দে মা-র ঘরে ঢুকেই চিৎকার করি, তোমরা এখনও আড্ডায় মত্ত?

মা-বড়মা ঝাঁপিয়ে পড়েন আমার উপর।

বড়মা বলেন, তুই আসার আগে এটা খবর দিতে পারিস না?

আমি কোনমতে হাসি চেপে বলি, আমার কে আছে যে খবর দেব? তোমরা দু'জনে কলেজ আর আড্ডায় ব্যস্ত, জ্যেঠু কারখানা নিয়ে ব্যস্ত, ভাইদা কুৎসিত বউ নিয়ে মত্ত।...

ঠিক সেই সময় ভাইদা আর প্রেয়সীর প্রবেশ।

প্রেয়সী ঘরের ভিতর এগিয়ে আসতে আসতে বলে, বয়ফ্রেণ্ড, মুখ সামলে কথা বলবে। আমি কুৎসিতও না, তোমার ভাইদাও আমাকে নিয়ে মত্ত না।

নটী বিনোদিনী, বাজে বকো না। ভাইদা অফিস থেকে এসেই তো তোমার আঁচলের তলায়...

তোমার ভাইদা অফিস থেকে এসেই আমায় আঁচলের তলায় ঢুকেছে বলেই গাড়িতে তোমার মালপত্র...

বড়মা গলা চড়িয়ে বলেন, এই শিবানী, তার মানে বাবাই এয়ারপোর্টে গিয়েছিল।

আমি আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে দু'হাত দিয়ে মা-বড়মাকে জড়িয়ে ধরি। ওরাও আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নেন।

ওদের দু'জনের আদর করার পর্ব চলতে চলতেই ভাইদা আমার মালপত্র ঘরে এনে রাখে। মালপত্র দেখেই মা প্রশ্ন করেন, হ্যাঁরে তাতাই, তুই কি পাকাপাকি ভাবে দিল্লী ছেড়ে চলে এলি?

আমি মা-র কথার জবাব না দিয়ে ব্রীফ কেসের ভিতর থেকে অ্যাপোলোর খামটা বের করে বড়মার হাতে দিই। উনি সঙ্গে সঙ্গে খামের ভিতর থেকে চিঠিপত্র বের করে পড়তে পড়তেই চিৎকার করেন, শিবানী, শিগগির পড়ে দেখ।

অ্যাপায়েন্টমেন্ট লেটার পড়েই মা খুশি আর গর্বের হাসি হাসতে হাসতে বলেন, ওরে ভারতী, তাতাই পঁয়ত্রিশ হাজারে জীবন শুরু করবে আর আমরা রিটায়ার করার আগেও এত মাইনে পাবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

শিবানী, ভুলে যাচ্ছিস কেন তাতাই সোনা দু'দুবার প্রেসিডেন্টস্ গোল্ড মেডেল পেয়েছে। ওর সঙ্গে আমাদের কেন, অনেকেরই তুলনা হয় না।

ভাইদার পর দুর্বা অ্যাপায়েন্টমেন্ট লেটার পড়েই হাসতে হাসতে বলে, বয়ফ্রেন্ড, তোমাকে অ্যাপোলো গাড়ি দেবে, থাকার জন্য সাজানো গোছানো বাড়ি দেবে, তার উপর এত টাকা দিয়ে কী করবে?

ব্যাঙ্গালোরের সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে বাঁদরামী করে ওড়াব।

সে সাহস তোমার নেই।

ও না থেমেই বলে, যে আমার সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারে না, সে আবার...

ওহে প্রেয়সী, আমি ভাইদার মত গোবেচারী গুড বয় না। তোমার মত আলতু-

ফালতু মেয়ের দিকে আমার চোখ ফেরাতেও ইচ্ছা করে না।

জ্যেঠু এসে হাজির হওয়ার ঝগড়া জমল না। অ্যাপায়েন্টমেন্ট লেটার দেখে জ্যেঠুও খুব খুশি। উনি মা-র দিকে তাকিয়ে বলেন, বৌমা, এবার থেকে আমরা মাঝে মাঝেই ব্যাঙ্গালোর যাবো।

হ্যাঁ, দাদা, নিশ্চয়ই যাবো।

জ্যেঠু হাসতে হাসতে বলেন, বুঝলে বৌমা, তাতাই সোনার বাড়িতে থাকব-খাবো, তাতাই সোনার গাড়ি চড়ব আর তাতাই সোনার টাকায় যাতায়াত করবো। ভাবতে পারো কি মজা হবে?

আমি বলি, জ্যেঠু, আপনারা যখন খুশি যাবেন ; নো প্রবলেম কিন্তু যে ছেলে ছেলে বলে অভিনয় করে, শুধু সেই নটী বিনোদিনীকে এখানে রেখে যাবেন।

দুর্বা সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত দিয়ে আমার দুটো কান ধরে বলে, মাই ডিয়ার বয় ফ্রেন্ড, আমি এক মাসের মধ্যে তোমার কাছে আসছি।

অসম্ভব।

অসম্ভব কেন?

সেই মহারাজার আমল থেকেই কসবার মেয়েদের ব্যাঙ্গালোর-মাইশোরে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

আমার কথা শুনে সবাই হো হো করে হাসেন।

প্লেনেই খেয়ে এসেছি ; তবু আমাকে জ্যেঠু আর ভাইদার সঙ্গে বসতে হলো একটু কিছু খাবার জন্য। খাওয়া-দাওয়ার পর্ব মিটে যাবার পর জ্যেঠুর ঘরেই শুরু হলো আমাদের আড্ডা। আমি জ্যেঠুর কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে শুয়েই কথাবার্তা শুনি, বলি। মাঝে মাঝে জ্যেঠু আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।

দুর্বা জ্যেঠুকে বলে, ছেলে, এই বুড়ো ধাড়ী তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়েছে কেন? তাছাড়া ওর মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দেবারই বা দরকার কি?

জ্যেঠু না, আমিই ওর কথায় জবাব দিই। বলি, ওহে নটী বিনোদিনী, ভুলে যাও কেন আমি তাতাইসোনা? তাছাড়া জ্যেঠু আমার খামখেয়ালী ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

তাই বলে আমার বুড়ো ছেলেকে তোমার সেবা করতে হবে?

না করে জ্যেঠু শান্তি পাবে নাকি?

হাসি-ঠাট্টার পর আমি বলি, জ্যেঠু, আমার একটা কথা আছে।

হ্যাঁ, বল।

মা আর বড়মা এবার কলেজের চাকরি ছেড়ে দিক।

জ্যেঠু কিছু বলার আগেই বড়মা বলেন, দ্যাখ তাতাই সোনা, সপ্তাহে ছ'দিন কলেজে যাই বলেই আমাদের দু'জনের শরীর ভাল আছে। কাজকর্ম না করে বাড়িতে বসে থাকলেই একটার পর একটা রোগ আমাদের ধরবেই।

মা সঙ্গে সঙ্গে বলেন, ভারতী, তুই ঠিক বলেছিস।

জ্যেঠু বলেন, হ্যাঁ, তাতাই সোনা, ওরা ঠিকই বলেছে। চুপচাপ বসে থাকলেই ওরা অসুস্থ হয়ে পড়বে।

আমি বলি, তার মানে আমার কাছে মা-বড়মার থাকা সম্ভব না।

দুর্বা বলে, বয়ফ্রেন্ড, কিছু চিন্তা করো না। আমি বছরে ছ'মাস এখানে থাকব; ছ'মাস তোমার কাছে থাকব।

ওহে প্রেয়সী, তুমি থাকলে তো আমার ফ্ল্যাটের দেয়াল ছাদ সব ফেটে যাবে।

রাত প্রায় দেড়টা-পৌনে দুটো পর্যন্ত আড্ডা চলার পর আমি জ্যেঠুর বিছানাতেই ঘুমিয়ে পড়ি।

আমি সোমবার রাত্রে এসেছি শনিবার ভোরের ফ্লাইটেই আমি ব্যাঙ্গালোর যাবো। মাঝখানে মাত্র চারটে দিন। মা-বড়মার খুব ইচ্ছা ছিল ছুটি নেবার কিন্তু কলেজে পরীক্ষা চলছিল বলে তা কিছুতেই সম্ভব হলো না। তথৈ ব চ জ্যেঠু আর ভাইদার অবস্থা। অর্থাৎ সারাদিন আমি আর প্রেয়সী আড্ডা দিই।

আমি শুয়েই থাকি। ও আমার পাশেই বসে।

ব্রয়ফ্রেন্ড, ব্যাঙ্গালোরে তোমার রান্নাবান্না কে করে দেবে?

না, না, ওসব ঝামেলায় আমি যাবো না।

তবে খাবে কোথায়?

অ্যাপেলোর ক্যান্টিন খুব ভাল। এক বেলা তো হাসপাতালেই খেয়ে নেবো; সম্ভব হলে ওখান থেকেই খাবার এনে অন্য বেলা চালিয়ে দেব।

তা যদি সম্ভব না হয়?

তাহলে অন্য কোন ব্যবস্থা করবো।

কিন্তু তোমার চা-টা বা ব্রেকফাস্ট কে করে দেবে?

ওখানে যাই ; তারপর দেখা যাবে।

একটু চুপ করে থাকার পর প্রেয়সী বলে, তোমাকে নিশ্চয়ই বেশ বড় ফ্ল্যাট দেবে?

দেওয়া উচিত।

তুমি এত বছর হস্টেলে কাটিয়েছ কিন্তু সেখানে তো অনেকেই থাকতো। সেখানে কথাবার্তা বলার লোকের অভাব হয়নি।

ও আমার মাথায় মুখে হাত দিতে দিতে বলে, ব্যাঙ্গালোরের অত বড় ফ্ল্যাটে কথা বলার মত একজনও থাকবে না। তোমার কষ্ট হবে না?

কষ্ট হবে কিনা জানি না কিন্তু নিশ্চয়ই ভাল লাগবে না।

তুমি তো হাসপাতালে এক মিনিটও চুপচাপ বসে থাকতে পারবে না। তাছাড়া অপারেশনের সময় তোমাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। অত পরিশ্রম করে ফ্ল্যাটে ফেরার পর কে তোমাকে এক গেলাস জল বা এক কাপ চা দেবে,

তার তো ঠিক নেই।

আমি একটু হেসে বলি, ওসব আমার অভ্যাস আছে।

তোমার অভ্যাস আছে বললেই তো আমি শান্তি পাবো না।

আমি হাসতে হাসতেই বলি, প্রেয়সী, অপাত্রের জন্য এত চিন্তা করো না।

একটু পরে আমি বলি, প্রেয়সী, অনেকক্ষণ গল্প করেছ। এবার তুমি তোমার ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করো।

তুমি মাত্র চারদিনের জন্য এসেছ আর আমি তোমাকে একলা রেখে বিশ্রাম করতে যাবো?

একলা থাকতে তো আমার কষ্ট হয় না। তুমি যাও।

না, ও যায় না। কখনও কখনও অদ্ভুতভাবে একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে ; আবার কখনো ও চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদাস দৃষ্টিতে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমিও ওর উদ্ধত যৌবনের উত্তাপ সহ্য করে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওকে দেখি। এক একবার মনে হয়, প্রেয়সীও কি আমারই মতন পাবার জ্বালায় জ্বলছে? নাকি ও আমাকেই চায়। আমাকে না পাবার দুঃখেই কি মনে শান্তি পাচ্ছে না?

জানি না।

শুধু সেদিনের জন্য আমার মনে এই প্রশ্ন আসেনি। পর পর চারদিন সারা দুপর এক মিনিটের জন্যও আমাকে একলা থাকতে দেয়নি। একইভাবে আমার বিছানায় আমার পাশে বসে থেকেছে। কখনও মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিয়েছে, কখনও আবার একটা হাত নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে।

আমার কত কি ইচ্ছা করেছে কিন্তু পারিনি। কোনদিন সে ইচ্ছা পূর্ণ করতেও পারব না।

বয়ফ্রেন্ড, আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

কি অনুরোধ রাখতে হবে?

আমাকে কথা দাও, আমার অনুরোধ রাখবে ; তা না হলে বলে কি লাভ?

আমি একটু হেসে বলি, হ্যাঁ, তোমার অনুরোধ রাখব।

ও একগাল হেসে আমার গাল টিপে বলে, এইজন্যই তো তোমাকে ভালবাসি। এখন আসল কথাটা বলো তো।

প্রেয়সী ঝুঁকে পড়ে আমার মুখের সামনে মুখ নিয়ে বলে, তুমি নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে রাত্তিরের দিকে ফোন করবে কিন্তু সবার সামনে আমি আমার কথা বলতে পারব না। প্লীজ তুমি দুপুরের দিকে আমাকে ফোন করবে।

ওর কথা শুনে আমি না হেসে পারি না।

ও দু'হাতের মধ্যে আমার একটা হাত নিয়ে বলে, কি হলো? ফোন করবে তো?

মুখে না, মাথা নেড়ে বলি করব।

চারটে দিন যেন হাওয়ার উড়ে গেল। আনন্দে-বিষাদে সবাই আমাকে বিদায় জানান আমিও বিচ্ছেদের বেদনা বুকে নিয়ে কলকাতা ত্যাগ করি।

জীবনে প্রথম চাকরি করতে চলেছি। ভাল-মন্দ নানা চিন্তা করতে করতেই প্লেন ব্যাঙ্গালোর এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করলো। টার্মিন্যাল বিল্ডিং-এ পৌঁছে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছি ; হঠাৎ এক নারীকণ্ঠে 'শুভ' ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়াতেই মৃণালিনী ছুটে এসে এক গাল হেসে আমার দুটো হাত ধরে বলে, শুভ, তুমি অ্যাপোলোয় জয়েন করছো শুনে আমি যে কি খুশি হয়েছি, তা বলতে পারবো না।

মৃণালিনী, তুমিও অ্যাপোলোতে?

ইয়েস, ইয়েস ; আমি তোমার কলিগ হবো।

মাই গড! হোয়াট এ কিউরিয়াস কো-ইন্সিডেন্স। এক সঙ্গে এম. বি. বি. এস. পড়লাম, এক সঙ্গে এম. এস. করলাম, আবার এক সঙ্গে আমরা চাকরি করবো!

মৃণালিনী ছাড়া অ্যাপোলোর এক বড় কর্তাও এসেছিলেন আমাকে রিসিভ করতে। মিঃ বৈদ্যনাথন আমার হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে বললেন, ওয়েলকাম টু ব্যাঙ্গালোর টু জয়েন অ্যাপোলো ফ্যামেলী।

গাড়িতে যেতে যেতে মিঃ বৈদ্যনাথন একটু হেসে আমাকে বলেন, আপনি আর মৃণালিনী এক সঙ্গে এম. বি. বি. এস আর এস. এস. করেছেন বলে ডাঃ মাথাই আপনাকে ওর পাশের ফ্ল্যাটে থাকার ব্যবস্থা করে...

আমি এটুকু শুনেই হেসে উঠি। বলি, হ্যাঁ, ভালই হলো ; চুটিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।

আমি একটু থেমে বলি, মৃণালিনী, তোমার মা কোথায়?

এখানে আমার কাছেই আছেন।

আন্টির শরীর কেমন আছে?

তুমি তো মার শরীরের কথা জানো। এমনি মোটামুটি ঠিক আছেন কিন্তু যখন-তখন অঘটন ঘটতে পারে।

ইন্দিরা নগরের তিনতলা বাড়ির তিনতলার ছ'নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে পৌঁছেই দেখি, পাশের ফ্ল্যাটের দরজায় লেখা—ডাঃ মৃণালিনী দেশপাণ্ডে! না হেসে পারি না। যেমন খুশি তেমনই বিস্মিত হই।

আমাকে ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়েই মিঃ বৈদ্যনাথন বলেন, হসপিট্যাল ক্যান্টিন থেকে আজ আর কাল দু'বেলাই আপনার খাবার-দাবার আসবে। তারপর আপনি যা বলবেন, সেইরকম বিধিব্যবস্থা করা হবে।

আমি বলি, আজ একবার ডাঃ মাথাই-এর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

মৃণালিনী সঙ্গে সঙ্গে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তোমাকে নিয়ে যাবো।

মিঃ বৈদ্যনাথন বিদায় নেবার পর মৃণালিনী আমাকে ফ্ল্যাটটি ভাল করে দেখায়। হ্যাঁ, ফ্ল্যাটটি যেমন ভাল, তেমনই সুন্দর করে সাজানো। ড্রইংরুম, দুটো বেডরুম, একটা স্ট্যাডি, কিচেন ও তার পাশেই ডাইনিং রুম। বেডরুম সংলগ্ন বাথরুম ছাড়াও ব্যালকনি আছে।

কি শুভ, পছন্দ হলো?

আমি কোনমতে হাসি চেপে বলি, সবই ভাল কিন্তু এই ফ্ল্যাটে একলা রাত কাটাবো কি করে?

ও আলতো করে আমার গালে একটা চড় মেরে হাসতে হাসতে বলে, সে সমস্যার সমাধানও কি আমাকে করতে হবে?

আর কে করবে?

যাইহোক আমার নতুন জীবন বেশ ভালভাবেই শুরু হলো। ডাঃ মাথাই নিঃসন্দেহে একজন বিখ্যাত সার্জেন ; তাছাড়া হাসপাতালের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি কিন্তু তাঁর ব্যবহার দেখে মনেই হলো না, এখানেই আমাদের পরিচয়। মনে হলো, উনি আমার বড় ভাই। যে প্রকৃত শিক্ষালাভ করে, সে যে বিনয়ী হয়, তার জ্বলন্ত উদাহরণ ডাঃ মাথাই। বুঝলাম, উনি সত্যি প্রফেসর রাও-এর প্রিয় শিষ্য।

আরো অনেককেই ভাল লাগলো। তবে খুব ভাল লাগলো অপারেশন থিয়েটারের এক দল নার্সের প্রধান মিস প্যামেলা নায়ারকে। বছর পঞ্চাশেক বয়স ; গায়ের রঙ বেশ কালো কিন্তু মুখের হাসি ঠিক ততটাই উজ্জ্বল। সার্জিক্যাল নার্স হিসেবে অতুলনীয়া আর অসম্ভব স্নেহপ্রবণ। দিদি না, আমাদের বয়সী ডাক্তার-নার্সদের উনি সন্তানের মতই স্নেহ করেন।

অ্যাপোলোতে কাজ শুরু করার দিন পনের-কুড়ি পরের কথা। প্রায় ঘণ্টা চারেক ধরে একটা অত্যন্ত জটিল অপারেশন করার পর সবাই মিলে কফি খাচ্ছি। মিস নায়ার কফি খেতে খেতেই বলেন, ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইউ আর রিয়েলী এ ম্যাজিসিয়ান ইন অপারেশন থিয়েটার। বুঝলাম, কেন তুমি দু'বার প্রেসিডেন্টস্ গোল্ড মেডেল পেয়েছ।

আমি ওনার মুখের দিকে তাকিয়ে বলি, প্লীজ, আপনি আমাকে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বলবেন না ; বলবেন, শুভ। আমি তো আপনার সন্তানের বয়সী ; আমি আপনাকে আম্মা বলব।

মিস নায়ার কফির কাপ নামিয়ে দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা ধরে কপালে স্নেহচুম্বন দিয়ে বলেন, বিয়ে করলে আমার ছেলেমেয়ে তোমার বয়সীই হতো। আমি তোমাকে শুভ বলেই ডাকব।

ইয়েস আম্মা, দ্যাটস্ ফাইন।

সব ডাক্তার-নার্সরা কফির কাপ তুলে ধরে বলেন, চিয়ার্স টু আম্মা-শুভ।

আমার আর মৃণালিনীর ডিউটি পড়ে কখনো আলাদা, কখনো একই সময়ে। যখন ও হাসপাতালে আর আমি ফ্ল্যাটে থাকি, তখন ফুরসত পেলেই আন্টির কাছে যাই।

মৃণালিনী যখন প্রথম দিল্লী আসে, তখন থেকেই আন্টি মাঝে মাঝেই ওকে দেখতে আসতেন ; থাকতেন সাউথ এক্সটেনশনে এক দূর সম্পর্কের মামাতো ভাইয়ের বাড়িতে। মৃণালিনীর সঙ্গে আমিও মাঝে মাঝে গিয়েছি ওখানে। সুতরাং ওনার সঙ্গে খুবই ভাল পরিচয় ছিল ; আমাকে খুবই স্নেহ করেন। মেয়ে যখন হাসপাতালে থাকে, তখন আন্টিকে একলাই থাকতে হয় ; লাঠি ভর দিয়ে কোনমতে ফ্ল্যাটের মধ্যে ঘোরাঘুরি করেন। তাইতো এখানে আমাকে পেয়ে উনি খুব খুশি।

কিছুক্ষণ টুকটাক কথাবার্তায় পরই আন্টি আমার হাতের উপর হাত রেখে বলেন, শুভ, এফ. আর. সি. এস. পাত্রের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে বাবা ভেবেছিলেন, মেয়ে খুব সুখে থাকবে। যখন উনি ন'বছরের ছেলে, সাত বছরের মৃণালিনী আর আমাকে ফেলে অন্য একজনকে বিয়ে করে বিলেত চলে গেলেন, তখন সে আঘাত আমি সামলে নিয়েছিলাম ছেলে-মেয়ের মুখ চেয়ে।

এইটুকু বলেই উনি হাঁপিয়ে ওঠেন। দু'এক মিনিট চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, কত কষ্ট করে ছেলেকে এঞ্জিনিয়ারিং পড়ালাম, বিয়ে দিলাম কিন্তু সে যে ওর বাবার মতই বিশ্বাসঘাতকতা করে বিদেশ চলে যাবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

আন্টি, এইসব কথা যত চিন্তা করবেন, ততই দুঃখ পাবেন। আপনি কেন ভাবেন না মৃণালিনীর মত মেয়ে পাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার?

হ্যাঁ, বাবা, আমি একশ বার স্বীকার করব, ওর মতো মেয়ে পেয়ে আমি যেমন সুখী, তেমনই গর্বিত।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে একবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, দু'দুবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে ; আমি যখন-তখন চলে যেতে পারি কিন্তু মেয়েটার জন্য খুবই চিন্তা হয়। আমি ছাড়া ওর আপনজন তো কেউ নেই।

আন্টি, মেয়েকে নিয়ে অত চিন্তা করবেন না। মৃণালিনী নিশ্চয়ই ভাল থাকবে।

কিন্তু ও যে প্রতিজ্ঞা করেছে বিয়ে করবে না কিন্তু একলা একলা কি এই পৃথিবীতে থাকা যায়?

হ্যাঁ, আন্টি, নিশ্চয়ই যায়। তা না হলে পৃথিবীর কোটি কোটি নারী-পুরুষ বিয়ে না করে বেঁচে আছে কী করে?

একই সঙ্গে ডিউটি পড়ুক বা না পড়ুক, আমি আর মৃণালিনী রোজই আড্ডা দিই। তবে আন্টির শরীরের কথা ভেবে মৃণালিনী আমার ফ্ল্যাটে এসেই গল্পগুজব

করতো। তবে দিনের বেলা আন্টি ঘুমুতেন না বলে ও খুব বেশিক্ষণ আড্ডা দিতো না ; অধিকাংশ সময়ই মা-র কাছে থাকতো। কিন্তু রাত্রে আন্টি ঘুমুবার ওষুধ খেয়ে শোবার পর মৃণালিনী ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমার সঙ্গে আড্ডা দিতো।

একদিন কথায় কথায় মৃণালিনী বলে, শুভ, তুমি না এলে আমি ঠিক এই চাকরি ছেড়ে চলে যেতাম।

কেন?

এখানে তো আমার একজনও বন্ধু নেই। হাসপাতাল থেকে এসে সব সময় কি মা-র সঙ্গে গল্প করতে ভাল লাগে?

ও না থেমেই বলে, তাছাড়া মা-র পক্ষে খুব বেশিক্ষণ কথা বলাও সম্ভব না।

আমি একটু হেসে বলি, তোমাকে না পেলে আমিও যে কতদিন এখানে থাকতে পারতাম, তা জানি না।

মৃণালিনী লম্বা সোফায় একটা কুশন মাথায় দিয়ে শুয়েছিল আমার চোখের সামনে। আমি ওকে একবার খুব ভাল করে দেখে নিয়ে চাপা হাসি হেসে বলি, তোমার মত সুন্দরী যুবতী বান্ধবীকে এইভাবে নাইটি পরে সামনে শুয়ে থাকতে দেখে যে কি আনন্দ পাই, তা তো তুমি জানো না।

আমি না থেমেই বলি, আচ্ছা মৃণালিনী, এভাবে এই রাত্রে আমার এখানে আসতে তোমার ভয় করে না?

ও হো হো করে হেসে উঠে বলে, তোমাকে দেখে আমি ভয় পাবো? বলো, আমাকে দেখে তুমি ভয় পাও।

মুখে স্বীকার করি না কিন্তু সত্যি আমার ভয় হয়। বার বার মনে হয়, মৃণালিনীর রূপ, যৌবন, মাদকতা ও গভীর রাত্রিতে আমার কাছে থাকা, কোন অঘটন ঘটাবে না তো?

জানি না।

কিন্তু প্রেয়সী আমার দেহে, মনে যে আগুন জ্বালিয়েছে, তা যে আমাকে একটা নারীদেহের নিবিড় ও উষ্ণ সান্নিধ্য পাবার জন্য পাগল করে তুলেছে। আমি প্রেয়সীকে নিয়েই পাগল হতে চাই কিন্তু ও ভাইদার স্ত্রী। তাইতো আমি কখনই সীমা অতিক্রম করতে পারিনি, পারব না।

সবই বুঝি কিন্তু মনের আগুন, দেহের জ্বালা মিটবে কী করে?

আমি এখানে আসার পর প্রত্যেক রবিবার কলকাতায় ফোন করে সবার সঙ্গে কথা বলি। তখন প্রেয়সী নেহাতই মামুলি কথা বলে কিন্তু দুপুরের দিকে কথা বললেই একেবারে ভিন্ন সুর।

বয়ফ্রেন্ড, তুমি বিশ্বাস করো, তোমাকে একটু কাছে পেতে, একটু আদর করতে

খুব ইচ্ছে করে।

ওহে নটী বিনোদিনী, কেন মিথ্যে কথা বলছো?

না, তাতাই, আমি মিথ্যে কথা বলছি না। তোমাকে আমার মনের কথাই বললাম।

হাজার হোক তুমি ভাইদার স্ত্রী। আমি কলকাতা গেলেই তো তুমি আমাকে কাছে পাও তখন আদর করলেই পারো। কে তোমাকে বাধা দিয়েছে?

না, না, অন্য কারুর সামনে তোমাকে আদর করবো না।

তাহলে চলে এসো এখানে।

সম্ভব হলে নিশ্চয়ই যেতাম।

আমি কখনই ওকে ইন্ধন যোগাই না কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও স্বীকার করব, আমার প্রতি ওর দুর্বলতার ইঙ্গিত দেখে মনে মনে উৎসাহিতও হই, উত্তেজিতও হই।

এই ভাবেই কেটে যায় তিন-চার মাস।

সেদিন ইভনিং শিফট্-এ আমার ডিউটি ইমার্জেন্সীতে, মৃণালিনীর ডিউটি সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে। দু'জনেরই ডিউটি শেষ হবার কথা দশটায় কিন্তু সাতটার পর পরই একটা বাস দুর্ঘটনার দশ-বারোজন গুরুতর আহত পেশান্ট হাজির হতেই শুধু আমি বা ইমার্জেন্সীর অন্য দু'জন সার্জেনকে না, মৃণালিনীকেও অপারেশন থিয়েটারে ঢুকতে হলো। আমরা দু'জনে হাসপাতাল থেকে বেরুলাম সাড়ে এগারোটায়।

লিফট্-এ তিনতলায় উঠে মৃণালিনী ব্যাগ হাতড়ে আবিষ্কার করলো যাবার সময় দরজার চাবি নিয়ে যেতে ভুলে গেছে। বলল, শুভ, এখন বেল বাজিয়ে মাকে ঘুম থেকে তুললে উনি সারা রাত্তির আর ঘুমুতে পারবেন না। তাই...

নো প্রবলেম। তুমি আমার ফ্ল্যাটে থেকে যাও।

হ্যাঁ, তাই থাকতে হবে।

ভিতরে ঢুকেই মৃণালিনী বলে, শুভ, আমি কিন্তু স্নান না করে ঘুমুতে পারবো না।

নো প্রবেলম। আমি সাবান-তোয়ালে দিচ্ছি।

আমি আমার পাশের বেডরুমের বাথরুমে আলো জ্বালিয়ে সাবান-তোয়ালে রেখে বলি, মৃণালিনী, যাও, স্নান করো। আমিও আমার বাথরুমে ঢুকছি।

হ্যাঁ, যাও।

আমি স্নান করে পায়জামা-গেঞ্জি পরে বেরুতে না বেরুতেই শুনতে পাই পাশের ঘর থেকে মৃণালিনী ডাকছে। তাড়াতাড়ি ঐ ঘরে ঢুকেই দেখি, বাথরুমের দরজা সামান্য একটু ফাঁক করে ও তাকিয়ে আছে।

ডাকছ কেন?

আমি কি পরে বেরুব?

ও মাই গড!

একটু হেসে বলি, আমার পায়জামা-কুর্তা পরবে?

তোমার পায়জামা কি আমার হয়?

মৃণালিনী সঙ্গে সঙ্গেই বলে, শুভ, তোমার ধুতি আছে?

হ্যাঁ, একটা আছে।

তাহলে ধুতি-কুর্তা আর পাউডার দাও তো।

শেষ পর্যন্ত মৃণালিনী যখন ধুতিকে লুঙির মত করে পরে আর গায় আমার ঢিলেঢালা আর্দ্দির পাঞ্জাবি পরে আমার ঘরে আমার সামনে হাজির হলো, তখন আমি যেমন হাসি, তেমনই খুশি।

হাসছ কেন?

তোমার অসীম ঐশ্বর্য দেখে।

ও একবার আনত দৃষ্টিতে নিজেকে দেখে নিয়েই বলে, খুব খারাপ লাগছে?

একটু বেশি ভাল লাগছে। আজ রাত্তিরে আর আমার ঘুম হবে না।

কেন?

মাঝে মাঝেই উঁকি দিয়ে তোমাকে দেখতে হবে না?

না দেখে থাকতে পারবে না?

অসম্ভব।

সত্যি?

হানড্রেড পার্সেন্ট সত্যি।

মৃণালিনী সঙ্গে সঙ্গেই দু'হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে করতে আমাকে নিয়ে আমার বিছানা লুটিয়ে পড়ে আর আমি?

প্রেয়সী আমার দেহ-মনের যে সুপ্ত কামনা-বাসনার আগুন-জ্বালিয়েছে, তারই জোয়ারে আমিও ভেসে গেলাম।

চোখ বুজে দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে শুয়েছিলাম। রোমন্থন করছিলাম সদ্য সমাপ্ত আনন্দ-মহোৎসবের স্মৃতি। এইভাবে কেটে গেল বেশ কিছু সময়।

তারপর মৃণালিনী ডাকল, শুভ।

বলো।

তুমি কিছু বলবে না?

শুধু বলব থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।

ফর হোয়াট?

ফর এভরিথিং।

এভরিথিং মানে?

আমি একটু হেসে ওর চোখের পর চোখ রেখে বলি, এত আদর, ভালবাসা, আনন্দ দেবার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাব না?

তুমিও তো আমাকে আদর-ভালবাসায় ভরিয়ে দিয়েছ।

তুমি খুশি?

নিশ্চয়ই খুশি কিন্তু...

মৃণালিনী কথাটা শেষ করে না শুধু মুখ টিপে হাসে।

আমি বলি, কিন্তু কি?

সত্যি বলব?

হ্যাঁ, বলো।

রাগ করবে না বা আমাকে খারাপ মনে করবে না?

আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে যে তোমাকে খারাপ মনে করব?

ও আমার মুখের উপর মুখ রেখে বলে, শুভ, আমাকে দূরে ঠেলে দিও না। তুমি মাঝে মাঝে আমাকে এইরকম আনন্দ দেবে।

আমি শুধু হাসি কোন কথা বলি না।

দু'এক মিনিট নীরব থাকার পর মৃণালিনী বলে, তুমি খুব ভাল করেই জানো, বাবা আমাদের দু'ভাই বোন আর মা-কে ফেলে নতুন বউ নিয়ে বিলেত যাবার পর থেকে কিভাবে মা আর আমার জীবন কাটছে।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, বাবার উপর রাগ করেই আমি এম. এস. করলাম।

হ্যাঁ, তা জানি।

আমি নিশ্চয়ই তোমার মত ব্রিলিয়ান্ট ছিলাম না কিন্তু তুমি তো জানো, আমি পড়াশুনার ক্ষতি করে একটি দিনও নষ্ট করিনি বা কারুর সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করার স্বপ্নও দেখিনি।

আমি দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা ধরে বলি, মৃণালিনী, এইসব কি আমি জানি না? সাত-আট বছর ধরে আমি তোমাকে দেখছি, তুমিও আমাকে দেখছ। আমি তোমার সবকিছু জানি, তুমিও আমার সব খবর রাখো।

শুভ, তোমাকে এখানে পেয়ে আমি যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছি। ঠিক যখন একলা একলা হাঁপিয়ে উঠেছিলাম, ঠিক তখনই তোমাকে কাছে পেলাম।

আমি একটু হেসে বলি, তুমি তো আমার মনের কথাই বললে। আমারও আর একলা একলা ভাল লাগছিল না।

মৃণালিনী আলতো করে আমাকে চুম্বন করে বলে, আজ থেকে আমিও একলা না, তুমিও একলা না।

আমি ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলি, ঘুমোবে না?

ঘুম আসছে না।

হাতের ঘড়ি দেখে বলি, জানো, তিনটে বেজে গেছে।

বাজুক, আজ তোমার বুকের উপর শুয়ে শুয়ে সূর্য ওঠা দেখব।

মৃণালিনী, শুধু সূর্যোদয় দেখব না ; আমরা সূর্যকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করব, আমরা কোনদিন অন্ধকারে তলিয়ে যাবো না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দু'জনে মিলে মানুষের সেবা করব।

ও পরম তৃপ্তির হাসি হেসে বলে, আমি কি শুধু শুধু নিজেকে তোমার কাছে বিলিয়ে দিলাম? তোমাকে আমি শুধু ভালবাসি না, তোমাকে শ্রদ্ধাও করি; তুমি আমার গর্ব, তুমি আমার অহঙ্কার।

দেখতে দেখতে ব্যাঙ্গালোর আসার পর তিন মাস কেটে গেল।

সেদিন শুক্রবার। সেদিন সকালেই আমার আর মৃণালিনীর ডিউটি তবে ওর ডিউটি অপারেশন থিয়েটারে,আমার ডিউটি ইমার্জেন্সীতে।

আন্টির খাবার হাসপাতালের ক্যান্টিন থেকে বারোটার মধ্যেই শুধু পৌঁছে যায় না, ক্যান্টিনের লোকটি ওনাকে খাইয়ে আসে। মর্নিং-এ ডিউটি থাকলে দুটো-আড়াইটের মধ্যেই আমাদের কাজ শেষ হয় তারপর ক্যান্টিন থেকেই খেয়েদেয়ে বাড়ি ফিরি। বিশ্রাম করি। সেদিনও তার ব্যতিক্রম হলো না।

বিকেলের দিকে আন্টির সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজব করলাম। নানা কথাবার্তার ফাঁকে উনি আমার একটা হাতের উপর হাত রেখে বলেন, শুভ, তুমি এখানে আসায় আমার খুব লাভ হয়েছে।

আমি একটু হেসে বলি, কি লাভ হয়েছে?

সব সময় তোমাদের দু'জনে তো একই সময়ে ডিউটি পড়ে না। তাই মেয়ে যখন হাসপাতালে থাকে, তোমাকে আমি কাছে পাই। তাছাড়া রোজই কোন না কোন সময়ে তোমাদের দু'জনকেই কাছে পাই।

উনি একটু হেসে বলেন, একি কম লাভ?

আমিও আপনার কাছে মায়ের স্নেহে পাচ্ছি; আপনার চাইতে আমিই বেশি লাভবান।

সাড়ে সাতটার পর পরই মৃণালিনী আন্টিকে খেতে দিল। ও আমার দিকে তাকিয়ে বলে, শুভ, তুমি স্নান করতে যাও। মাকে ঘুম পাড়িয়ে আমি আসছি।

আমি স্নান করে বিছানায় আধা-শোওয়া অবস্থায় মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি অব সার্জারির জার্নাল পড়ছিলাম। মৃণালিনী ঘরে ঢুকেই বলল, মেলবার্ন ইউনিভার্সিটির জার্নাল পড়ছো?

হ্যাঁ।

তুমি এই জার্নাল পড়া শেষ করলে তোমাকে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির জার্নাল দেব। লিভার অপারেশনের উপর দুটো অসাধারণ লেখা আছে।

হ্যাঁ, দিও।

তোমার পড়ার পর আমি দু'একটা কথা জানতে চাইব। ঠিক সেই সময় টেলিফোন। রিং শুনেই বুঝলাম, বাইরের ফোন।

মৃণালিনী একটু হেসে বলে, নিশ্চয়ই মা-বড়মার ফোন। আমি রিসিভার তুলতেই শুনি জ্যেঠুর গলা, তাতাইসোনা, আমি, বৌমা আর তোর বড়মা গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা করব।

আমি অবাক হয়ে বলি, তার মানে?

ওরে তাতাইসোনা, তুই আমাদের তিনজনকে মাসে মাসে পাঁচ হাজার করে টাকা পাঠাচ্ছিস, তা দিয়ে আমরা কী করবো?

তোমরা খাও-দাও, ওড়াও, দান করো বা জমিয়ে রাখো—এককথায় তোমাদের যা ইচ্ছে তাই করবে।

তাইতো বলছি, গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা করব বলে আমরা ঐ টাকা দিয়ে প্লেনের টিকিট কেটেছি তোর কাছে যাবো বলে।

আমি চিৎকার করে বলি, জ্যেঠু, সত্যি তোমরা তিনজনে আসছো?

আসছি মানে কালই আসছি। নে, বৌমার সঙ্গে কথা বল।

মা 'তাতাই সোনা' বলতে না বলতেই আমি বেশ উত্তেজিত হয়ে বলি, মা, তোমরা এলে দারুণ মজা হবে।

শুধু তুই কেন, আমরাও তো খুব আনন্দ পাবো।

মা মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, মৃণালিনীকেও খবরটা দিস।

ও এখানেই আছে ; কথা বলো।

মৃণালিনী মা-র সঙ্গে কথা বলার পর বড়মার সঙ্গেও কথা বলে। তারপর বড়মা আমাকে বলেন, তাতাইসোনা, তোকে কাছে পাবার জন্য তিনজনেই ছটফট করছিলাম বলে শেষ পর্যন্ত তিনজনেই ছুটি নিয়ে তোর কাছে আসছি।

তোমাদের যে শুভবুদ্ধি হয়েছে তা জেনেই ভাল লাগছে।

আমি মুহূর্তের জন্য না থেমেই বলি, বড়মা, ভাইদা আর প্রেয়সী আসছে না?

তোর ভাইদা এখন শুধু ঘুমুতে বাড়ি আসে। সকাল সাতটার মধ্যে বেরিয়ে যায় আর ফিরতে রাত দশটা-সাড়ে দশটা।

বড়মা একটু থেমেই বলেন, আমাদের সল্টলেকে কত চুরি-ডাকাতি হয়, তা তো তুই ভাল করেই জানিস। তাই দুটো বাড়ি শুধু দুই মাসীর উপর ছেড়ে রেখে যাওয়া যায় না।

এর পর ভাইদা একটু সুযোগ পেলেই যেন...

সে কথা আর আমাকে বলতে হবে না। তোর কাছে যাবার জন্য ওরা দু'জনেই পা বাড়িয়ে আছে।

ঠিক আছে। আমি এয়ারপোর্টে থাকব আর মনে রেখো, কাল তোমাদের তিনজনকে ঘুমুতে দেব না।

ভয় দেখাচ্ছিস কি! আমরাও তোকে ঘুমুতে দেব না।

আমি রিসিভার নামিয়ে রাখতেই মৃণালিনী বলে, তোমার কাছে ওদের তিনজনের কথা এত শুনি যে আমিও ওদের দেখার জন্য হাঁ করে বসে আছি।

আমি একটু হেসে বলি, মৃণালিনী, ওদের তিনজনকে তোমার যেমন ভাল লাগবে, সেইরকম ওরাও তোমাকে ঠিক মেয়ের মতই স্নেহ করবেন।

হ্যাঁ, সে বিশ্বাস আমার আছে।

আমরা পাশাপাশি শুয়ে কথা বলি।

মৃণালিনী, কাল সকালে হাসপাতালে গিয়েই ওদের তিনজনের খাবার-দাবারের ব্যাপারে...

শুভ, ওদের খাবার-দাবারের ব্যাপারে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। আমি মিঃ রেড্ডির সঙ্গে কথা বলে সব ব্যবস্থা করবো। তুমি ডাঃ মাথাইকে বলে একটা বড় গাড়ির ব্যবস্থা করো।

উনি কিছু মনে করবেন না তো?

না, না, কিছু মনে করবেন না বরং খুশি হবেন।

মৃণালিনী একটু থেমে বলে, যখন আমি পারবো না, তখন তুমি ওদের নিয়ে বেরুবে ; আবার যখন তোমার সময় হবে না, তখন আমি ওদের নিয়ে বেরুব।

হ্যাঁ, তাহলে খুব ভাল হবে।

ও একটু হেসে বলে, শুভ, তুমি আমাকে যত অপদার্থ ভাবো, আমি ঠিক তত অপদার্থ না। একটু বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে।

মৃণালিনী, তুমি যেভাবে আন্টির দেখাশুনা সেবা-যত্ন করছো, তা দেখে কেউ তোমাকে অপদার্থ মনে করবে না।

ওপাশ ফিরে আমার গলা জড়িয়ে বলে, আর কথা বলো না। এবার ঘুমোও। সাড়ে পাঁচটায় দু'জনকেই উঠতে হবে।

হ্যাঁ, আমরা দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

পরের দিন সকালে ডাঃ মাথাইকে সব কথা বলতেই উনি একটু হেসে বলেন, আজ দুপুরেই তোমাকে একটা বড় গাড়ি দিয়ে দেব। ওরা যে ক'দিন থাকবেন সেই ক'দিন এইগাড়ি তোমার কাছেই থাকবে। দ্বিতীয়তঃ তোমার আর মৃণালিনীর ডিউটি সকাল আর আফটারনুন-এ থাকবে, যাতে তোমরা একজন ওদের কাছে থাকো।

আমি খুশির হাসি হেসে বলি, স্যার, দ্যাট উড বী ফাইন।

আগে আমার কথা শোনো।

হ্যাঁ, স্যার, বলুন।

তুমি একদিন ওদের মাইশোর নিয়ে যেও। ওদের প্রত্যেকেরই বয়স হয়েছে। সেজন্য সকালে গিয়ে বিকেলে-সন্ধেয় ফিরে আসা ঠিক হবে না। আমাদের গেস্ট হাউসেই তোমরা থাকবে।...

স্যার, মাইশোরে আমাদের গেস্ট হাউস আছে?

ডাঃ মাথাই একটু হেসে বলেন, ভারতবর্ষের পনের-কুড়িটা শহরে আমাদের গেস্ট হাউস আছে।

শুনে আমি হাসি।

উনি হাসতে হাসতেই বলেন, ওরা যেন বুঝতে পারেন, তুমি গ্রেট অ্যাপোলো পরিবারের একজন। অল দ্য বেস্ট!

ওরা ঠিক এক সপ্তাহ এখানে ছিলেন। হাসপাতাল কতৃপক্ষের সহযোগিতা দেখে ওরা মুগ্ধ হন। আর প্রথম দিন খেতে বসেই জ্যেঠু চিৎকার করেন, ওরে তাতাই সোনা, এত দামী হোটেলের খাবার এনেছিস কেন?

জ্যেঠু, খাবার এসেছে হাসপাতালের ক্যান্টিন থেকে।

এই খাবার তোদের ক্যান্টিনের?

হ্যাঁ।

একটু থেমে বলি, ফাইভ স্টার হোটেলে যত রকমের খাবার পাওয়া যায়, তার চাইতে অনেক বেশি ধরনের খাবার আমাদের ক্যান্টিনে পাওয়া যায়।

বলিস কিরে?

জ্যেঠু শুধু পেশান্টদের জন্যই সত্তর-আশি রকমের খাবার তৈরি হয়। তাছাড়া ডাক্তার-নার্স-হসপিট্যাল স্টাফ ও গেস্টদের জন্য কত কি হয়।

আশ্চর্য!

খাবার-দাবারে উপর দিয়ে চোখ বুলিয়েই উনি বলেন, এই বয়সে এত খাওয়া যায়?

খাবার-দাবারের ব্যবস্থা আমি করিনি ; মৃণালিনী করেছে। নিন্দা-প্রশংসা সবই ওর প্রাপ্য।

এবার জ্যেঠু মৃণালিনীর দিকে তাকিয়ে বলেন, মা, এই বয়সে কি আমরা এত খেতে পারি?

জ্যেঠু, আমাদের হাসপাতালে তিনজন হাইলি কোয়ালিফায়েড ডায়াটিসিয়ান আছেন। তাদের একজন ক্যালোরি ও আপনাদের শরীরের প্রয়োজন বুঝে খাবার তৈরি করেছেন।

ওর কথা শুনে মা-বড়মা হো হো করে হেসে উঠে বলেন, শোনো মেয়ের কথা।

এবার মৃণালিনী ওনাদের শাসন করে বলে, চুপচাপ খেয়ে নিন ; তা না হলে

তিনজনই আমার কাছে বকুনি খাবেন।

জ্যেঠু মা-র দিকে তাকিয়ে বলেন, বৌমা, চুপচাপ খেয়ে নাও তা না হলে এই বুড়ো বয়সে ডাক্তার মেয়ের বুকুনি খেতে হবে।

মহীশূরে দুপুরে পৌঁছে গেস্ট হাউসে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করার পর ওদের বৃন্দাবন গার্ডেন দেখিয়ে চামুণ্ডা মন্দিরে নিয়ে যাই আরতির সময়। পরদিন ব্রেকফাস্টের পর ওদের নিয়ে যাই প্যালেস দেখাতে। তারপর খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে ফিরে আসি ব্যাঙ্গালোর।

মা-বড়মা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আন্টির কাছেই থাকেন। আমি বা মৃণালিনী জ্যেঠুকে নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরতে যাই ; বিকেলে তিনজনকে নিয়েই বেড়াতে যাওয়া হয়। তাতাই সোনা, আমি আর শিবানী ব্যাঙ্গালোর সিল্কের শাড়ির দোকানে যাব।

বড়মা, আমি তো জানি না, কোন দোকানে ভাল ব্যাঙ্গালোর সিল্কের শাড়ি পাওয়া যায়। মৃণালিনী আড়াইটের মধ্যেই হাসপাতাল থেকে ফিরবে ; তোমরা ওর সঙ্গে যেও।

ঠিক আছে।

যাবার দিন বড়মা একটা খুব সুন্দর ব্যাঙ্গালোর সিল্কের শাড়ি মৃণালিনীকে দিয়ে বলেন, মা, তুমি এই শাড়িটা পরবে। এর সঙ্গে ব্লাউজ পিস্ আছে ; বানিয়ে নিও। তারপর এই শাড়ি পরে একটা ছবি তুলে আমাদের পাঠাবে।

মৃণালিনী মা-বড়মাকে প্রণাম করে বলে, মা ছাড়া অন্য কেউ আমাকে কোন উপহার দেয় নি আপনাদের কাছ থেকেই প্রথম উপহার পেলাম।

ও প্রায় কেঁদে ফেলেছিল। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলে, হ্যাঁ, ছবি পাঠাবো।

এয়ারপোর্টে আমি আর মৃণালিনী ওদের তিনজনকে প্রণাম করি ওরা আমাদের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আদর করেন।

মা মৃণালিনীর থুতনি ধরে বলেন, আমারা এসেছিলাম ছেলেকে দেখতে। ছেলেকে দেখা ছাড়াও তোমার মত সোনার টুকরো মেয়েকেও আমরা পেলাম।

মৃণালিনী একটু হেসে বলে, মা, আপনাদের চাইতে আমার ঝুলিতে অনেক বেশি জমা হলো। আমি দুটো মা ছাড়াও একটা জ্যেঠু পেলাম।

জ্যেঠু ওকে বলেন, আমি বেশ অহঙ্কারী হয়ে কলকাতা যাচ্ছি। এবার থেকে সবাইকে জোর গলায় বলব, শুধু আমাদের ছেলে না, মেয়েও এম. এস।

এই পৃথিবী বার বার রঙ বদলায়। গ্রীষ্মের দাহ শেষ হয় বর্ষার আগমনে পচা ভাদ্দরে যখন মন বিষণ্ণতায় ভরে যায়, তখনই শরতের নীল

আকাশে টুকরো টুকরো সাদা মেঘের নাচানাচি দেখে আমাদের মন আনন্দে ভরে যায়। আবার বসন্তের মাদকতার পিছনেই লুকিয়ে থাকে শীতের জড়তা। মানুষের জীবনেও একইভাবে চলে আলো-আঁধারের খেলা।

সেদিন রবিবার ; আমার আর মৃণালিনীর অফ ডে। আন্টিকে ব্রেকফাস্ট খাইয়ে দিচ্ছিল মৃণালিনী ; হঠাৎ উনি ঢলে পড়লেন। ওর বিকট চিৎকার শুনে ছুটে গেলাম আমি কিন্তু দেখলাম, উনি সব সুখ দুঃখের সীমানা ছাড়িয়ে এক অজানা দুনিয়ায় পাড়ি দিয়েছেন। আর্তনাদ ও বিলাপে মৃণালিনী কিছুক্ষণের জন্য মুর্ছাও গেল।

তারপর?

ডাঃ মাথাই থেকে শুরু করে হাসপাতালের এক দল ডাক্তার-নার্স-কর্মীর চোখের সামনে সূর্যাস্তের বিষণ্ণ আলোয় আন্টির মরদেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেল।

খবর পেয়ে কলকাতা থেকে ছুটে এলেন মা-বড়মা আর বম্বে থেকে এলেন দেশপাণ্ডে পরিবারের পরমাত্মীয়ের মত প্রতিবেশী দম্পতি সদাশিব পাতিল ও শ্রীমতী প্রমীলা পাতিল। ওদের চারজনকে কাছে পেয়ে মৃনালিনী একটু স্বাভাবিক হয়।

অধ্যাপক পাতিল একদিন আমাকে বলেন, মৃণালিনী সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হলে আপনি একটা বিষয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা করবেন।

কী বিষয়ে?

মৃণালিনীদের বোম্বের বাড়িটা তৈরি করেছিলেন ওর ঠাকুর্দা। পুরনো বাংলো ধরনের বাড়ি কিন্তু চারপাশে প্রচুর জমি।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন ক্যান ইউ ইমাজিন শিবাজী পার্কের কাছে প্রায় দু'একর জমির উপর ওদের বাড়ি।

বলেন কি?

এখন ঐ জমির দাম দেড়-দু কোটি টাকা।

মাই গড!

আমার মত হচ্ছে, মৃণালিনী ঐ জমি-বাড়ি বিক্রী করে দিক। ওখানে যে মাল্টি স্টোরি হবে, তাতে দু'একটা ফ্ল্যাট ছাড়াও মোটা টাকা পাবে।

অধ্যাপক পাতিল একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, আমার মনে হয়, এটাই বাস্তব ব্যবস্থা হবে। এই বিষয়ে আপনি ওর সঙ্গে আলোচনা করলে খুব ভাল হয়।

হ্যাঁ, করবো কিন্তু একমাস দু'মাস পরে করবো।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই করবেন। আমরা কাল চলে যাবো বলেই আজ আপনাকে এইসব কথা বললাম।

পাতিল দম্পতি চলে যাবার পরদিনই মা-বড়মাও কলকাতা গেলেন। মৃণালিনী শুরু করলো হাসপাতাল যাওয়া। সঙ্গে সঙ্গে ও আরো বেশি আমাকে আঁকড়ে ধরে।

রাত্রে আমার গলা জড়িয়ে শুয়ে বলে, তুমি পাশে না থাকলে আমি কিছুতেই এই বিপদ সামলে স্বাভাবিক হতাম না। তাছাড়া মা-বড়মা আর পাতিল আংকল-আন্টি দেশের দুই প্রান্ত থেকে এলেন বলে মনে হলো, মা চলে গেলেও আমি একেবারে নিঃসঙ্গ হইনি।

মৃণালিনী, তুমি যেভাবে তোমার মা-র সেবা-যত্ন করতে, তা চোখে না দেখলে আমিও বিশ্বাস করতে পারতাম না। তোমাকে নিয়ে আন্টির যে কত শান্তি, কত গর্ব ছিল, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

ও একটু হেসে বলে, মা বুঝি তোমাকে এইসব বলতেন?

প্রতিদিন বলতেন।

আস্তে আস্তে ও আরো স্বাভাবিক হয়। ওর মুখে হাসি ফুটে ওঠে, চোখের চাহনিতে দেখা যায় মাদকতার ইঙ্গিত। তারপর হঠাৎ একদিন রাত্রে শোবার পর পরই শুরু হয় ওর পাগলামী।

আমি নিশ্চিন্ত হলাম। মৃণালিনী আবার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়েছে।

মাস দেড়েক পরে একদিন রাত্রে ভাইদার ফোন—ভাইয়া, একটা বড় প্রজেক্টের কাজে আমাকে তিন সপ্তাহ হায়দ্রাবাদ থাকতে হবে।

কবে হায়দ্রাবাদ যাবে?

আমাকে সামনের সোমবার পৌঁছতে হবে।

তুমি আমার কাছে আসবে না?

হায়দ্রাবাদ যাবো আর তোর কাছে যাবো না, তাই কখনো হয়?

ভাইদা না থেমেই বলে, আমি শনিবার তোর কাছে আসছি ; ওখান থেকে সোমবার সকালের ফ্লাইটে হায়দ্রাবাদ যাবো।

ভেরি গুড।

আবার ফেরার পথেও তোর কাছে যাবো।

ভেরি ভেরি গুড!

আমি হাসতে হাসতে চিৎকার করে বলি, থ্রী চিয়ার্স ফর ভাইদা।

শনিবার এয়ারপোর্টে গিয়ে দেখি, শুধু ভাইদা না, প্রেয়সীও এসেছে।

আমি কোনমতে হাসি চেপে বলি, ও ভাইদা, সঙ্গে এই পোঁটলা নিয়ে এসেছে কেন?

ভাইদা একটু হেসে বলে, ও এমন কাণ্ড শুরু করলো...

এমন কাণ্ড মানে?

ও শুধু বার বার সবাইকে বলে, তোমরা সবাই বয়ফ্রেন্ডের কাছে যাচ্ছো কিন্তু আমাকে কেন কেউ নিয়ে যাচ্ছে না?

ও মাই গড!

তারপর মা-বাবা-ছোট মা বললেন, ওকে নিয়ে যেতে। ওর টিকিট কাটলাম তো এয়ারপোর্টে এসে।

গাড়িতে আসতে আসতে বলি, ওহে প্রেয়সী, আমি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ; আমি তো কোন যুবতীর সঙ্গে এক ছাদের তলায় রাত কাটাই না।

প্রেয়সী চাপা হাসি হেসে বলে ; বয়ফ্রেন্ড, আমি তো রাত্তিরে তোমার ওখানে থাকব না।

আমি গলা চড়িয়ে বলি, ও ভাইদা, তোমার বউ বিকাশদার সঙ্গে রাত কাটাতে এখানে এসেছে?

ওরা দু'জনেই হো হো করে হেসে ওঠে। তারপর ভাইদা হাসতে হাসতেই বলে, ভাইয়া, তুই কি কিছুতেই বিকাশদাকে ভুলতে পারছিস না?

তোমার বউয়ের অসভ্যতার জনই তো ঐ হতভাগাকে ভুলতে পারি না।

যাইহোক প্রেয়সীকে দেখে মৃণালিনী মুগ্ধ হয়ে ওকে বলে, তোমার পাশে তো কোন বিখ্যাত হিরোইনও দাঁড়াতে পারবে না।

আমি বলি, মৃণালিনী, তোমার কি মাথা খারাপ হলো? এই অপদার্থ, কুৎসিত, ছলনাময়ীকে দেখে মুগ্ধ? তোমার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি।

দুটো দিন অসম্ভব আনন্দে কাটে। তারপর ভাইদা চলে যায়। আমার আর মৃণালিনীর ডিউটি এক শিফট্-এ পড়ছে না বলে প্রেয়সীরও সময় বেশ ভাল কাটে। তবে যখন শুধু আমি আর প্রেয়সী থাকি, তখন ও আমার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে মেলামেশা করে যে আমি অস্বস্তিবোধ না করে পারি না। আবার খুব জোর করে বলতেও পারি না, আমার ভাল লাগে না। তবু আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলি না, ও ভাইদার স্ত্রী।

এইভাবেই একটা সপ্তাহ কাটে।

পরের সপ্তাহে পর পর দু'দিন ইমার্জেন্সিতে আমার নাইট ডিউটি পড়লো। বাড়ি ফিরে আসার পর প্রেয়সীর কত প্রশ্ন। সারারাত কি করে ডিউটি দাও? একটুও ঘুমুবার সময় পাও না? অত রাত্তিরে তো বিশেষ পেশেন্ট যায় না তবে ঘুমোতে পারো না কেন?

আমি আর মৃণালিনী দু'ইজনেই হেসে উঠি। আমি কিছু বলার আগেই মৃণালিনী বলে, দুর্বা, এমন কোনদিন যায় না, যেদিন কেস আসবে না। আর অ্যাকসিডেন্ট কেস হলেই আমাদের মতো সার্জেনকে দু'তিনটে অপারেশন করতেই হবে।

অত রাত্তিরে অপারেশন করতে অসুবিধে হয় না?

না, না, কোন অসুবিধে হয় না।

সপ্তাহের শেষের দিকে পর পর দু'দিন মৃণালিনীর নাইট ডিউটি পড়লো। সাড়ে ন'টার মধ্যেই মৃণালিনী হাসপাতালে রওনা হয়। তারপর প্রেয়সী বলে, বয়ফ্রেন্ড, আমি গা ধুয়ে চেঞ্জ করে আসি। তারপর আমরা এক সঙ্গে খাবো।

হ্যাঁ, তুমি বাথরুমে যাও।

প্রেয়সী যে পোষাকে বাথরুম থেকে বেরুলো, তা দেখে আমি অবাক। একে ঐ খাজুরাহোর জীবন্ত মূর্তি, তার উপর এই পাতলা ফিনফিনে মাইটি। ওকে এই পোষাকে দেখে যে কোন পুরুষ উন্মাদ হয়ে যাবে।

আমি ওকে দেখে একটু হাসি কিন্তু কোন মন্তব্য করি না। প্রেয়সী পাশের ঘরে গিয়ে চুল আঁচড়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে একটু হেসে দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা ধরে দু'গালে চুমু খেয়ে বলে, এসো, বয়ফ্রেন্ড, খেয়ে নিই।

হ্যাঁ, চলো।

টুকটাক গল্পগুজব করতে করতেই আমরা খেয়ে নিই।

আমি শুয়ে পড়ার দু'পাঁচ মিনিট পরই প্রেয়সী আমার পাশে এসে বসে। আমার একটা হাত নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলে, তুমি কি খুব টায়ার্ড? এখনই ঘুমোবে?

আমি একটু হেসে বলি, সব স্বাভাবিক মানুষই তো রাত্তিরে ঘুমোয়।

কিন্তু বিশেষ বিশেষ সময় তো রাত জাগতে ইচ্ছে করে, তাই না?

আমি হাসতে হাসতেই বলি, নাইট ডিউটি ছাড়া মনের মত মেয়ে পেলে রাত জাগতে পারি কিন্তু সে রকম মেয়ে তো আজ পর্যন্ত পেলাম না।

সত্যি পাও নি?

পেলে তো জানতেই পারতে।

এইসব কথাবার্তা চলতে চলতেই ও আমার পাশে শোয়। আমার মাথায়-মুখে হাত দিতে দিতে বলে, বয়ফ্রেন্ড, একটা কথা বলব, বিশ্বাস করবে?

কেন বিশ্বাস করবো না?

ও হঠাৎ উপুড় হয়ে শুয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে আমার মুখের সামনে মুখ নিয়ে বলে, তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমার একটুও ভাল লাগে না।

সব সময় আমাকে কাছে পেতে ইচ্ছে করে?

ও এক গাল হেসে বলে, হ্যাঁ।

দু'এক মিনিট আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর ও আমার বুকের উপর মুখ রেখে দু'হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে। ওর এই নিবিড় আলিঙ্গন আমাকে চঞ্চল করে তোলে কিন্তু খুবই অস্বস্তি বোধ করি। বলি, প্রেয়সী,

প্লীজ এভাবে জড়িয়ে ধরো না।

কেন?

তুমি বুঝতে পারছো না কেন বারণ করছি?

না তো।

তোমার এই খাজুরাহোর জীবন্ত মূর্তি আমার মত যুবককে জড়িয়ে ধরলে কি হয়, তা জানো না?

কি আবার হবে?

প্রেয়সী, প্লীজ ঠিক হয়ে শোও।

তোমার খারাপ লাগছে?

হ্যাঁ, খারাপ লাগছে।

তুমি মিথ্যে কথা বলছো।

কী করে জানলে?

তা বলব না কিন্তু জানি।

প্রেয়সী মুখ উঁচু করে মুহূর্তেই জন্য আমার দিকে তাকিয়েই আবার বুকের উপর মুখ রেখে বলে, তোমাকে জড়িয়ে যে আমার কি ভাল লাগছে, তা বলতে পারবো না।

আমি দু'হাত দিয়ে ওকে সরাবার যত চেষ্টা করি, ও তত বেশি আমাকে জড়িয়ে ধরে।

এইভাবে দু'পাঁচ মিনিট কাটার পর প্রেয়সী মুহূর্তের জন্য উঠে বসেই আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে উন্মাদিনীর মতো আমাকে চুম্বন করতে শুরু করে।

আমি কোন মতে ওর মুখখানা সরিয়ে দিয়ে বলি, তুমি কি শুরু করলে বলো তো? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

ও সত্যি উন্মাদিনীর মতো আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, বয়ফ্রেন্ড, তোমার পায়ে পড়ি। আজ আমাকে ফিরিয়ে দিও না। তোমাকে না পেলে আমি বাঁচব না। প্লীজ আজ আমাকে তুমি...

আমি আর সহ্য করতে পারি না। আমি এক ধাক্কায় ওকে সরিয়ে দিয়েই উঠে বসে সজোরে ওর গালে এক চড় মেরে বলি, গেট আউট ফ্রম মাই রুম।

প্রেয়সী ধীর পদক্ষেপে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আমি পাশ ফিরে শুয়ে শূন্য দৃষ্টিতে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই ভাবি, একি করলাম? আমি ভাইদার স্ত্রী গায় হাত দিলাম! ওকে মারলাম। ছি! ছি!

আমি দুঃখে, অনুশোচনায় মরে যাই। আরো কত কি ভাবি! আমি কি জীবনে

কোনদিন ওর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো? ও যদি আর কোনদিন আমার সঙ্গে কথা না বলে, তাহলে মা-বড়মা জ্যেঠু-ভাইদা কি মনে করবে?

ভাবতে গিয়েও আমার মাথা ঘুরে ওঠে।

আকাশ-পাতাল আরো আরো কত কি ভাবি কিন্তু কোন কূলকিনারা পাই না। আমি নিজেকেই নিজে ঘেন্না করতে শুরু করি। একবার মনে হলো, একটা চাবুক দিয়ে নিজেকে পেটাই।

কিন্তু না, আমি কিছুই করি না। আমি প্রাণহীন পাথরের মূর্তির মত শুয়ে থাকি নড়তে-চড়তেও যেন ভয় করে।

এভাবে কতক্ষণ কাটলো, তা জানি না।

তারপর কি যেন একটা অদ্ভুত শব্দ হঠাৎ আমার কানে আসে। দশ-পনের মিনিট ভালভাবে খেয়াল করার পর মনে হলো, অনেক দূরে কে যেন কাঁদছে। কিন্তু...

প্রেয়সী না তো?

এবার আমি না উঠে পারি না। ধীর পদক্ষেপ দু'এক পা এগুতেই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, অন্য কেউ না, প্রেয়সীই কাঁদছে।

নাইট ল্যাম্পের আবছা আলোয় এগিয়ে গিয়ে দেখি, ও ঘরের বিছানা খালি। তারপর দেখি, দরজার পাশে মেঝেতে বসে মাথায় হাত দিয়ে প্রেয়সী কাঁদছে। আমি আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করি না। এগিয়ে ওর দুটি পা ধরে বলি, প্রেয়সী, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি মুহূর্তের জন্য বোধহয় মানুষ ছিলাম না বলেই এমন জঘন্য অন্যায় করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা না করলে আমি আর কলকাতায় যেতে পারবো না।

ও কোন কথা না বলে আমার হাত দুটো সরিয়ে দেয়। দু'এক মিনিট ও কোন কথা বলে না। তারপর মুখখানা তুলেই আবার নামিয়ে নিয়ে বলে, আমিও একটা খুব খারাপ কাজ করেছি।

কী করেছ?

তোমার ডায়েরীর অনেকগুলো পাতা পড়েছি।

বেশ করেছ।

আমি ওর মাথায় মুখে হাত দিয়ে বলি, প্রেয়সী, প্লীজ এভাবে বসে থেকো না।

আমি ওর হাত দুটি ধরে বলি, ওঠো।

হ্যাঁ। ও আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। আমি ওর হাত ধরে বাথরুমে নিয়ে যাই চোখে-মুখে জল দেবার পর তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিই। তারপর ওর হাত ধরে আস্তে আস্তে আমার ঘরে নিয়ে আমার বিছানায় শুইয়ে দিই। আমিও পাশে শুই।

আমি ওর একটা হাত দুটো হাতের মধ্যে নিয়ে বলি, তুমি ঠিকই বলেছিলে; আমি তোমার সব চাইতে কাছের মানুষ হবো, তুমিও আমার সব চাইতে কাছের মানুষ হবে। তোমার এই বিশ্বাস, আস্থা কোনদিন আমি হারাতে পারবো না।

আমি আলতো করে একটু টান দিতেই প্রেয়সী পাশ ফিরে শোয়। নিঃশব্দে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমিও ওর চোখ থেকে দৃষ্টি সরাতে পারি না।

এই নীরবতার মধ্যেই বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়।

আমি ওর মুখের উপর হাত রেখে বলি, তোমার ছেলের নাম হবে বিবেক, মেয়ের নাম হবে প্রেরণা। তুমি আর ভাইদা আপত্তি না করলে তোমার প্রথম সন্তানকে আমি মানুষ করবো।

প্রেয়সীর মুখে একটা হাসি ফুটে ওঠে তারপর বলে, পারবে?

নিশ্চয়ই পারবো।

আমার মুখের উপর একটা হাত রেখে বলে, আমি হাসি মুখে আমার সন্তানকে তোমার হাতে তুলে দেব কিন্তু একটা কথা বলো।

বলো, কি জানতে চাও।

আমার সন্তানকে কেন রাখতে চাইছো?

ভাইদা আর তোমার অর্ধেক তো তোমার সন্তানের মধ্যে পাবো, ওকে নিয়েই আমার জীবন বেশ আনন্দে কেটে যাবে।

ও আমার হাতে আলতো করে চুমু খেয়ে বলে, তুমি একটা আস্ত পাগল।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে আলো দেখেই জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাই। হ্যাঁ, অন্ধকার রাত্রির মেয়াদ শেষ, রাজার রাজা দিবাকর আসছেন।

প্রেয়সী, দেখো, দেখো, অন্ধকার শেষ ; একটু পরেই সূর্যের আলোয় ভরে যাবে চারদিক।

ও খুব আস্তে আগে গেয়ে ওঠে—

আলো আমার, আলো ওগো,
আলো ভুবন-ভরা,
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার,
আলো হৃদয়-হরা।...